পাট ও পাট জাতীয় আঁশ ফসলের উৎপাদন কলাকৌশল বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট
মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা-১২০৭

রচনা ও সংকলনে

ড. সালেহ মোহাম্মদ আশরাফুল হক, পিএসও
পেস্ট ম্যানেজমেন্ট বিভাগ

ড. মোঃ হারুন অর রশিদ, এসএসও
প্রজনন বিভাগ

ড. মোঃ বাবুল হোসেন, এসএসও
জুট ফার্মিং সিস্টেম্স বিভাগ

এবং

ড. মোঃ সামিউল হক, সিএসও
ফাইবার কোয়ানলিটি ইম্প্রুভমেন্ট বিভাগ।

সম্পাদনায়

ড. মোঃ আইয়ুব খান, সিএসও
জুট ফার্মিং সিস্টেমস বিভাগ

এবং

ড. মোঃ মুজিবুর রহমান
পরিচালক (কৃষি) চলতি দায়িত্ব
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট।

সূচিপত্র

ক্র. নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
০১।	ভূমিকা	৪
	পাট গবেষণার পটভূমি	৪
	পাট, কেনাফ ও মেস্তা ফসলের অঞ্চলভিত্তিক উপযোগিতা	৫
০২।	বিজেআরআই উদ্ভাবিত পাট, কেনাফ ও মেস্তার প্রচলিত উন্নত জাতের তালিকা	৬
	দেশী পাটের উন্নত জাত পরিচিতি	৭
	তোষা পাটের উন্নত জাত পরিচিতি	৯
	কেনাফের উন্নত জাত পরিচিতি	১১
	মেস্তার উন্নত জাত পরিচিতি	১২
০৩।	পাট, কেনাফ ও মেস্তা ফসলের আধুনিক চাষ পদ্ধতি	১৩
	বীজ সংগ্রহ, বীজের অংকুরোদগম পরীক্ষা ও জমি নির্বাচন	১৩
	জমি তৈরী ও সার প্রয়োগ	১৪
	জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগের সময় এবং পরিমাণ, সার প্রয়োগ পদ্ধতি	১৫
	বীজের হার, বপন ও গাছের ঘনত্ব এবং নিড়ানী ও চারা পাতলাকরণ	১৬
	পাট শাক উৎপাদন কলাকৌশল	১৭
	সবজি মেস্তার জাত পরিচিতি ও উৎপাদন কলাকৌশল	২২
০৪।	পাট, কেনাফ ও মেস্তার প্রধান প্রধান রোগ বালাই ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা	২৪
	সারণি ৪: বালাইনাশক-এর তালিকা এবং প্রয়োগ মাত্রা	২৮
০৫।	পাট, কেনাফ ও মেস্তার প্রধান প্রধান পোকা মাকড় ও দমন ব্যবস্থা	২৯
	সারণি ৫: বালাইনাশক-এর তালিকা ও প্রয়োগমাত্রা	৩৩
০৬।	পাট ও পাট জাতীয় ফসলের জমির জন্য উপযুক্ত নিষ্কাশন ব্যবস্থা	৩৪
০৭।	ফসল কর্তন পরবর্তী ব্যবস্থাপনা	৩৫
	রিবন রেটিং পদ্ধতি	৩৭
	আঁশের রং উজ্জ্বলকরণ	৩৮
	আঁশের শ্রেণী বিন্যাস	৩৯
০৮।	পাট ভিত্তিক শস্য বিন্যাস	৪২
	আগাম তোষা পাটের জাত ফসল বিন্যাসে অন্তর্ভুক্তির প্রধান বৈশিষ্টসমূহ	৪৩
	আগাম দেশী পাটের জাত ফসল বিন্যাসে অন্তর্ভুক্তির প্রধান বৈশিষ্টসমূহ	৪৩

পাট ও পাট জাতীয় আঁশ ফসলের উৎপাদন কলাকৌশল

ভূমিকাঃ

পাট বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী আঁশ উৎপাদনকারী অর্থকরী ফসল। পাট চাষ ও পাট শিল্পের সাথে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি জড়িত। যুগ যুগ ধরে এ দেশের কৃষকের আর্থিক সচ্ছলতার মূলে ছিল পাট। পাট উৎপাদনকারী পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের পাটের গুণগতমান সবচেয়ে ভাল এবং উৎপাদনের বিবেচনায় ভারতের পরে দ্বিতীয় স্থানে আছে বাংলাদেশ। বর্তমানে দেশে ৬-৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাট এবং পাটজাতীয় আঁশ ফসলের (কেনাফ ও মেস্তা) চাষাবাদ হচ্ছে। একদিকে সোনালি আঁশ, অন্যদিকে রুপালি কাঠি- দুয়ে মিলে নতুন সম্ভাবনা তৈরী করেছে পাট। পাটকাঠির ছাই বা চারকোল থেকে কার্বন পেপার, কম্পিউটার ও ফটোকপিয়ারের কালি, আতশবাজি, ফেসওয়াশ ও মোবাইলের ব্যাটারির উপকরণ, বিভিন্ন প্রসাধনপণ্য ইত্যাদি সামগ্রী তৈরী করা হচ্ছে। পাট পাতা দেশের বহুল ব্যবহৃত একটি উপাদেয় শাক এবং শুকনো পাট পাতার পানীয় 'চা' এর মত ব্যবহারের কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে। আঁশ ছাড়াও কেনাফ বীজ থেকে ভোজ্য তেল এবং মেস্তার মাংসল বৃতি (শাঁস) থেকে জ্যাম, জেলী, জুস, আচার, পানীয় ইত্যাদি প্রস্তুত করা যায়, যার ব্যাপক বাণিজ্যিক সম্ভাবনা রয়েছে। পাট শিল্পের পুনরুজ্জীবন ও আধুনিকায়নের ধারা বেগবান করা, পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন বাস্তবায়ন, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে সরকার প্রতি বছর ৬ মার্চ জাতীয় পাট দিবস উদযাপনের ঘোষণা দিয়েছে এবং যথারীতি তা উদযাপিত হচ্ছে।

পাট বাংলাদেশের পরিচিতির অন্যতম অনুষঙ্গ। স্বাধীনতার পরও প্রায় এক যুগ ধরে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে পাটের অবদানই ছিল মুখ্য। দেশের প্রায় ২.৫-৩.০ কোটি মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ খাতের সাথে জড়িত। সাম্প্রতিক সময়ে পরিবেশ সচেতনার কারণে বিশ্ববাজারে পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা ও দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষকরা নতুন করে পাট চাষে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। বাংলাদেশের পাটশিল্পের অভিজ্ঞতা শতবর্ষ পুরনো, দেশের বিজ্ঞানীরা পাটের জিনকোড আবিষ্কারের কৃতিত্বও দেখিয়েছেন। বিজেআরআই ২০১০ সালে প্রথম তোষা পাটের জীবনরহস্য (জিনোম সিকোয়েন্স) আবিষ্কার, ২০১২ সালে পাটের কান্ড পচা রোগ প্রতিরোধী পাটজাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে পাটসহ পাঁচ শতাধিক উদ্ভিদের জন্য ক্ষতিকারক ছত্রাকের জীবন রহস্য উন্মোচন এবং ২০১৩ সালে দেশী পাটের জীবনরহস্য আবিস্কারের ফলে এ সংক্রান্ত গবেষণায় সাফল্য দেখিয়েছে বাংলাদেশ। উন্মোচিত জিনোম তথ্যকে কাজে লাগিয়ে বর্তমানে স্বল্প জীবনকালীন, প্রতিকূল পরিবেশ, রোগবালাই ও পোকা-মাকড় সহনশীল, বাজারের বিভিন্ন চাহিদা মাফিক পণ্য উৎপাদন উপযোগী পাটের জাত উদ্ভাবনের গবেষণা এগিয়ে চলেছে। ইতোমধ্যে আগাম (১০০ দিন) কর্তন উপযোগী তোষা পাটের ১টি জাত 'বিজেআরআই তোষা পাট-৮' (রবি-১) নামে অবমুক্ত করা হয়েছে যার ফলন প্রচলিত জাতের চেয়ে ১৫-২০% এবং ভারতীয় জাত জেআরও-৫২৪ এর চেয়ে ৮-১০% বেশী। দেশব্যাপী এ জাতের প্রচলনের মাধ্যমে আমাদের কৃষক অধিক লাভবান হতে পারেন।

পাট গবেষণার পটভূমিঃ

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশের পাট ও পাট জাতীয় আঁশ ফসলের প্রাচীনতম গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এদেশে পাটের উপর গবেষণা শুরু হয় ১৯০৪ সালে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৪ সালে এ্যাক্টের মাধ্যমে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটকে একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা প্রদান করা হয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাস্তবতায়, পরিবর্তিত জলবায়ু বিবেচনায় নিয়ে পাট চাষের উন্নয়ন ও পাট আঁশের বহুমুখী ব্যবহারের লক্ষ্যে স্বল্প খরচে অধিক উৎপাদনসহ লাভজনকভাবে পাট চাষ ও উন্নত মানের আঁশ উৎপাদনের সময়োপযোগী ও

অঞ্চল ভিত্তিক আধুনিক কলাকৌশল কৃষকের মাঠে পৌঁছানের উদ্দেশ্যে বিজেআরআই বর্তমানে তি
গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে- (১) পাট ও পাট জাতীয় আঁশ ফসলের উচ্চ ফলনশীল জ
উৎপাদন কলাকৌশল এবং বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ বিষয়ক গবেষণা, (২) পাটের শিল্প/কারিগরি
প্রচলিত পাট পণ্যের মান উন্নয়ন এবং মূল্য সংযোজিত নতুন নতুন বহুমুখী পাট পণ্য উদ্ভাবন সংক্র
এবং (৩) পাট, তুলা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম আঁশের সংমিশ্রণে পাট জাত টেক্সটাইল প
সংক্রান্ত গবেষণা।

পাট, কেনাফ ও মেস্তা ফসলের অঞ্চলভিত্তিক উপযোগিতাঃ

গাঙ্গেয় অববাহিকায় পদ্মা নদীর বিস্তীর্ণ তীরবর্তী অঞ্চল বিশেষ করে এর দক্ষিণাঞ্চলে তোষা পাটের অ
পক্ষান্তরে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা অঞ্চলে মূলতঃ দেশী পাট আবাদ হতো। এ এলাকার জমি বেশি
পাট পচানোর পানির প্রাপ্যতা ছিল প্রচুর, ফলে এ সব অঞ্চলে দেশী পাটের চাষ হতো। তাছাড়া রংপুর,
বগুড়া ও রাজশাহী এলাকাগুলোকে একত্রে বলা হতো 'উত্তরবঙ্গ বা নর্দান' এলাকা। এখানকার জমি
উঁচু এবং তুলনামূলক ভাবে শুষ্ক। সত্তর দশকের পূর্বে পাট আবাদের ক্ষেত্রে দেশী ও তোষা পাটের অ
৭০:৩০। সত্তর দশকের পর থেকে এ ধারা পাল্টে যেতে থাকে। সময়োপযোগী ও প্রচলিত শস্যক্রমের স
করে আগাম বপন উপযোগী খাট দিন-দৈর্ঘ্য সহনশীল তোষা পাটের জাত উদ্ভাবন, পাট উৎপাদন প্রযুক্তি
এবং চিরাচরিত বন্যার প্রবণতা কমে আসায় তোষা পাট এখন সব অঞ্চলেই কম বেশি আবাদ হচ্ছে।
অনেক এলাকায় দেশী পাটের স্থানে কেনাফ আবাদ করা হচ্ছে। বর্তমানে দেশে তোষা পাট, দেশী পাট
জাতীয় অন্যান্য আঁশ ফসলের চাষ যথাক্রমে প্রায় ৮৫:০৮:০৭ অনুপাতে এসে দাঁড়িয়েছে। পাট উৎপাদ
বৃষ্টিপাতের চাহিদা ১৮৮-২০৩ মি.মি.। পাট চাষের জন্য দো-আঁশ থেকে বেলে-দোআঁশ মাটি ভাল।
ফসল এলাকার কৃষি ও অর্থনীতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাই দেশের প্রায় এলাকার শস্য বি
বেশী পাট অন্তর্ভূক্ত থাকে। তোষা পাট প্রধানত উঁচু জমিতে ভাল হয়, পক্ষান্তরে দেশী পাট নীচু, মধ্যম নী
সকল জমিতেই চাষ করা যায়।

বর্তমানে কেনাফ চাষ জনপ্রিয়তা পাচ্ছে এবং সম্প্রসারিত হচ্ছে। মধ্যম থেকে মধ্যম নিচু জমি এবং নি
অঞ্চল বিশেষ করে মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, নড়াইল, উত্তর-পূর্ব খুলনা, উত্তর বাকেরগঞ্জ,
ময়মনসিংহ ও রংপুর জেলার নীচু অঞ্চল কেনাফ চাষের উপযোগী। এ ফসল কেটে সময়োপযোগী আ
চাষ করা যায়। তাছাড়া যে সব উঁচু বা টান জমিতে বর্ষার পানি দাঁড়ায় না সেখানে মেস্তার আবাদ করা
শুষ্ক অঞ্চলের প্রান্তিক জমিতে আবাদ করা যায়।

পাট, কেনাফ ও মেস্তা ফসলের বপন সময় দিন দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভরশীল। পাট, কেনাফ ও মেস্তা খা
ফসল। দিনের দৈর্ঘ্য ১২.৫ ঘন্টা বা তার কম হলেই আগাম ফুল আসবে। দিনের দৈর্ঘ্য ১২.৫ ঘন্টা বা
হলে ফুল আসা বিলম্বিত হয়। তাই নির্ধারিত সময়ের আগে বীজ বপন করলে এ জাতীয় ফসলে আগাম
তখন গাছের মাথা ফেটে শাখা-প্রশাখা জন্মায়, গাছের বৃদ্ধি থেমে যায় এবংফলন কম হয়। আবার দে
করলে গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় না। কাজেই ভাল ফলন এবং তিন অথবা
শস্য পর্যায়ে পাট, কেনাফ ও মেস্তাকে অর্ন্তভূক্ত করতে হলে যথাসময়ে বীজ বপন করতে হবে।
বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়া ও কৃষি ব্যবস্থার প্রতি নজর রেখে বাংলাদেশ পাট গবেষণা
স্থান উপযোগী দেশী ও তোষা পাট, কেনাফ ও মেস্তার সর্বমোট ৫২টি জাত উদ্ভাবন করেছে। এদের মধ্যে
আবাদকৃত কিছু জাতের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নরূপ।

বিজেআরআই **উদ্ভাবিত পাট, কেনাফ ও মেস্তার প্রচলিত** উন্নত **জাতের তালিকা**

ক্রঃ নং	জাতের নাম	অবমুক্ত সন	উদ্ভাবন পদ্ধতি (প্যাডিগ্রী/বিশুদ্ধ সারি)
দেশী পাট (*Corchorus capsularis* L.)			
১।	ডি-১৫৪-২	১৯৬১	বিশুদ্ধ সারি নির্বাচন
২।	সিভিএল-১	১৯৭৭	বিশুদ্ধ সারি নির্বাচন
৩।	সিভিই-৩	১৯৭৭	বিশুদ্ধ সারি নির্বাচন
৪।	সিসি-৪৫	১৯৭৯	বিশুদ্ধ সারি নির্বাচন
৫।	বিজেআরআই দেশি পাট-৫ (বিজেসি-৭৩৭০)	১৯৯৫	ডি-১৫৪ এবং সিসি-৪৫ এর সংকরায়ন
৬।	বিজেআরআই দেশি পাট-৬ (বিজেসি-৮৩)	১৯৯৫	সিভিএল-১ এবং রেস-ফুলেশ্বরী এর সংকরায়ন
৭।	বিজেআরআই দেশি পাট-৭ (বিজেসি-২১৪২)	২০০৮	সিসি-৪৫ এবং বিজেসি-৭১৮ এর সংকরায়ন
৮।	বিজেআরআই দেশি পাট-৮ (বিজেসি-২১৯৭)	২০১৩	সিসি-৪৫ এবং ফরমোজা ডিপ রেড এর সংকরায়ন
৯।	বিজেআরআই দেশি পাট-৯ (বিজেসি-৫০০৩)	২০১৭	সিভিএল-১ এবং এক্সেশন-১৮৩১ এর সংকরায়ন
তোষা পাট (*Corchorus olitorius* L.)			
১।	ও-৪	১৯৬৭	বিশুদ্ধ সারি নির্বাচন
২।	ও-৯৮৯৭	১৯৮৭	ও-৫ এবং বিজেড-৫ এর সংকরায়ন
৩।	বিজেআরআই তোষা পাট-৩ (ওএম-১)	১৯৯৫	বিশুদ্ধ সারি নির্বাচন
৪।	বিজেআরআই তোষা পাট-৪ (ও-৭২)	২০০২	ও-৯৮৯৭, ও-২০১২ এবং ও-৯৮৯৭ এর পশ্চাৎ সংকরায়ন
৫।	বিজেআরআই তোষা পাট-৫ (ও-৭৯৫)	২০০৮	উগান্ডা রেড এবং ও-৪ এর সংকরায়ন
৬।	বিজেআরআই তোষা পাট-৬ (ও-৩৮২০)	২০১৩	বিশুদ্ধ সারি নির্বাচন
৭।	বিজেআরআই তোষা পাট-৭ (এমজি-১)	২০১৭	বিশুদ্ধ সারি নির্বাচন
৮।	বিজেআরআই তোষা পাট-৮(রবি-১)	২০১৯	ও-৪ এর টাইলিং এবং নির্বাচন
কেনাফ (*Hibiscus cannabinus* L.)			
১।	এইচসি-২	১৯৭৭	বিশুদ্ধ সারি নির্বাচন
২।	এইচসি-৯৫	১৯৯৫	বিশুদ্ধ সারি নির্বাচন
৩।	বিজেআরআই কেনাফ-৩ (বট কেনাফ)	২০১০	বিশুদ্ধ সারি নির্বাচন
৪।	বিজেআরআই কেনাফ-৪ (কেই-৩)	২০১৭	বিশুদ্ধ সারি নির্বাচন
মেস্তা (*Hibiscus sabdariffa* L.)			
১।	এইচএস-২৪	১৯৭৭	বিশুদ্ধ সারি নির্বাচন
২।	বিজেআরআই মেস্তা-২ (সজী মেস্তা-১)	২০১০	বিশুদ্ধ সারি নির্বাচন
৩।	বিজেআরআই মেস্তা-৩ (সামু-৯৩)	২০১৭	বিশুদ্ধ সারি নির্বাচন

দেশী পাটের উন্নত জাত পরিচিতি

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত পাট, কেনাফ ও মেস্তার জাতের সংখ্যা ৫২টি। দে এলাকা ভিত্তিক জাত পাট বা সাদা পাট বা গুটি পাট বলা হয়। এর মধ্যে যে কয়টি দেশী পাটের জাত ভাবে ফল বেশী আবাদ করা হচ্ছে শুধু সেগুলোর পরিচয় দেয়া হলোঃ

বপন সময়ের উপর ভিত্তি করে দেশী পাটকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

(১) দেশী আগাম বপন উপযোগী জাতঃ যেমন সিসি-৪৫, সিভিই-৩, বিজেআরআই দেশী পাট-৫

(২) দেশী নাবী বপন উপযোগী জাতঃ যেমন- সিভিএল-১, বিজেআরআই দেশী পাট-৬, ডি-১৫৪, বি দেশী পাট-৭, বিজেআরআই দেশী পাট-৮।

সারণি ১: সিভিএল-১, সিভিই-৩, বিজিসি-৮৩ ও ডি-১৫৪ জাতের বৈশিষ্ট্য

বৈশিষ্ট্য	দেশি পাট জাত			
	সিভিএল-১	সিভিই-৩	বিজেসি-৮৩	ডি-১৫৪
পাতা	সবুজ, বোঁটায় কোন তামাটে রং নেই	অপেক্ষাকৃত লম্বা, বোটর উপর উজ্জ্বল তামাটে রং দেখা যায়	সরু ও কিনারা ঢেউ খেলানো এবং অগ্রভাগ চোখা	বোটার উপরিভাগ তামাটে
কান্ড	বেশ মোটা, লম্বা ও সবুজ	সবুজ	সম্পূর্ণ গাছ সবুজ	কান্ডের গোড়া আ মোটা
বপন সময়	এপ্রিল-মে মাস (মধ্য চৈত্র-বৈশাখ মাস)	মার্চ-এপ্রিল (সারা চৈত্র মাস)	মার্চ-এপ্রিল (চৈত্রের ২য়-৩য় সপ্তাহ)	মার্চ-এপ্রিল (সারা মাস)
ফলন	৫৬ মণ/একর বা ২.৪৬ টন/হেঃ	৪৯ মণ/একর বা ১.৯৭ টন/হেঃ	৫১ মণ/একর বা ২.১৯ টন/হেঃ	৫৩ মণ/একর বা টন/হেঃ
ছবি				

বিজেআরআই দেশী পাট-৭ (বিজেসি-২১৪২)

চিত্রঃ বিজেআরআই দে

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যঃ গাছ লম্বা ও দ্রুত বর্ধনশীল, কান্ড সম্পূর্ণ সবুজ, পাতা বল্লমাকৃতির, বীজের রঙ নীল, এ জাতের আঁশ ধবধবে সাদা, বীজ এবং আঁশের রং দিয়ে জাতটি সহজে সনাক্ত করা যায়।

বপন সময়ঃ চৈত্রের প্রথম থেকে মধ্য বৈশাখ (মধ্য মার্চ - ৩০ এপ্রিল)

বিশেষ বৈশিষ্ট্যঃ আঁশ উজ্জ্বল সাদা বর্ণের, ফলে ব্লিচিং খরচ কম। সোলানেসী পরিবারভূক্ত যেমন আলু, বেগুন ইত্যাদি ফসলের জমিতে এ জাত বপন না করাই ভাল তাতে রোগের আক্রমন বেশী হয়।

ফলনঃ হেক্টর প্রতি ২.৫০ - ২.৭৫ টন বা বিঘা প্রতি ৯.২৫ - ১০.২০ মণ

বিজেআরআই দেশী পাট-৮ (বিজেসি-২১৯৭)

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যঃ পাতা দীর্ঘ বল্লমাকৃতির, গাছ হালকা লাল, পাতার বোঁটার উপরিভাগ উজ্জ্বল তামাটে লাল রং এবং বোঁটার নিম্নভাগ ও ফলকের সংযোগস্থানে আংটির মতো লাল গোল দাগ আছে। এ জাতটি মধ্যম মাত্রার লবণাক্ততা সহিষ্ণু।

বপন সময়ঃ মধ্য চৈত্র - মধ্য বৈশাখ (৩০ মার্চ - ৩০ এপ্রিল)

বিশেষ বৈশিষ্ট্যঃ এ জাতটি দ্রুত বর্ধনশীল, মধ্যম মাত্রার লবণাক্ততা সহিষ্ণু ও মোজাইক রোগ প্রতিরোধী।

ফলনঃ হেক্টর প্রতি ২.৭০ -২.৯০ টন বা বিঘা প্রতি ১০-১০.৭০ মণ

চিত্রঃ বিজেআরআই দেশী পাট-৮

বিজেআরআই দেশী পাট-৯ (বিজেসি-৫০০৩)

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য: গাছ সবুজ, স্বল্প মেয়াদী জাত, পাতার বোঁটার উপরিভাগ হালকা লাল রঙ, পাতা বল্লমাকৃতির, জাতটির আঁশ তুলনামূলকভাবে সাদা ও কম কাটিংস যুক্ত।

বপন সময়: মধ্য চৈত্র - বৈশাখের প্রথম (৩০ মার্চ - ১৬ এপ্রিল)

বিশেষ বৈশিষ্ট্য: এ জাতটি দ্রুত বর্ধনশীল, মৃদু লবাণাক্ততা সহিষ্ণু ও মোজাইক রোগ প্রতিরোধী।

ফলন: হেক্টর প্রতি ২.৬-৩.০ টন বা বিঘা প্রতি ৯.৬০ - ১১.১০ মণ

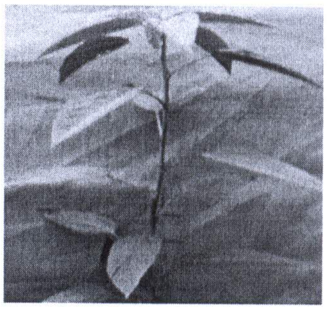

চিত্রঃ বিজেআরআই দেশী পাট-৯

তোষা পাটের উন্নত জাত পরিচিতি

তোষা পাটকে এলাকা ভিত্তিক জাত পাট বা বগি পাট বা গুটি পাট বলা হয়। বপনের সময়ের উপর ভিত্তি
তোষা পাটকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

(১) চৈতালী জাত: রবি-১, ও-৯৮৯৭, ওএম-১ এবং ও-৭২

(২) বৈশাখ জাত: ও-৪

সারণি-২: ও-৯৮৯৭, ওএম-১, ও-৭২ এবং ও-৪ জাতের বৈশিষ্ট্য

বৈশিষ্ট্য	তোষা পাট জাত			
	ও-৯৮৯৭	ওএম-১	ও-৭২	ও-৪
পাতা	ও-৪ জাতের তুলনায় বেশী লম্বা ও চওড়া	ঘন সবুজ, মসৃণ ও চকচকে	গোলাকৃতি ওএম-১ এর পাতার মত তবে চকচকে নয়	সবুজ, লম্বা ও চওড়
কান্ড	সম্পূর্ণ সবুজ	ঘন সবুজ	গাছ সম্পূর্ণ সবুজ	গাছ সম্পূর্ণ সবুজ
বপন সময়	১৫ মার্চ-১৫ মে মাস (চৈত্রের প্রথম থেকে বৈশাখের শেষ পর্যন্ত)	১০ মার্চ-১৫ এপ্রিল (ফাল্গুনের শেষ থেকে বৈশাখ মাসের শেষ পর্যন্ত)	১৫ মার্চ-৩০ এপ্রিল (ফাল্গুনের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত)	১৫ এপ্রিল-১৫ মে(বৈশাখ মাস)
বীজের রং	সবুজ	গাঢ় খয়েরী	নীলাভ সবুজ	সবুজ
ফলন	৫০ মণ/একর বা ২.৭৩ টন/হেঃ	৫২ মণ/একর বা ২.৪৯ টন/হেঃ	৫৩ মণ/একর বা ২.৯০ টন/হেঃ	৫০ মণ/একর বা ২ টন/হেঃ
ছবি				

বিজেআরআই তোষা পাট-৬ (ও-৩৮২০)

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য: গাছের কান্ড সবুজ, মসৃণ, দ্রুত বর্ধনশীল। পাতা লম্বা ও বর্শাফলাকৃতির। পাতার দৈর্ঘ্য প্রস্থের অনুপাত ২.৬৬ যা অন্যান্য তোষা জাত অপেক্ষা বেশি। গাছের আগা গোড়ায় কান্ডের পরিধি প্রায় একই। বীজের রং নীলাভ সবুজ।

বপন সময়: এপ্রিলের ১ম সপ্তাহ থেকে এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত। তবে এপ্রিলের ১ম সপ্তাহের মধ্যে বপন করলে এবং ১১০ দিন পরে কর্তন করে আঁশের গুণগত মান ও ফলন উভয়ই ভাল পাওয়া যায়।

বিশেষ বৈশিষ্ট্য: আলোক সংবেদনশীল। নাবীতে বপনোপযোগী, দ্রুত বর্ধনশীল ও আগাম কর্তনযোগ্য। আঁশের মান ভাল (উজ্জল সোনালী) ।

ফলন: হেক্টর প্রতি ২.৫০-২.৮০ টন

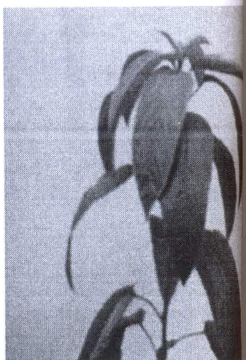

চিত্রঃ বিজেআরআই তোষ

বিজেআরআই তোষা পাট-৭ (এমজি-১)

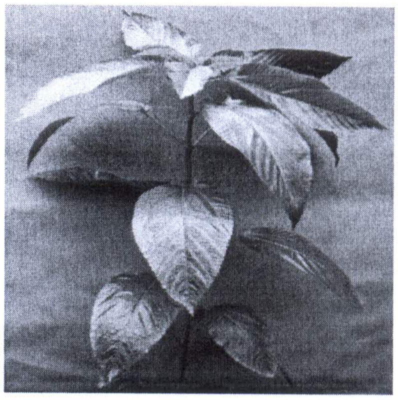

চিত্রঃ বিজেআরআই তোষ পাট-৭

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য: গাছের কান্ড গাঢ় সবুজ, মসৃণ। পাতা ডিম্বাকৃতির লম্বাটে। পাতার উপরিভাগ চকচকে হলেও বীজের রঙ নীলাভ সবুজ যা ওএম-১ জাত থেকে ভিন্ন রঙের (অনুজ্জল খয়েরী) ।

বপন সময়: চৈত্রের প্রথম থেকে বৈশাখ মাসের ১ম সপ্তাহ পর্যন্ত (মধ্য মার্চ থেকে মধ্য এপ্রিল) যে কোন সময় এ জাত বপন করা যায় । বীজ বপনের ১১০ দিন পরে গাছ কর্তন করেও আঁশের ভালো ফলন পাওয়া যায় ।

বিশেষ বৈশিষ্ট্য: দ্রুত বর্ধনশীল ও আগাম কর্তন উপযোগী। তিন ফসলী শস্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার উপযোগী। উচ্চফলনশীল ও আঁশের রং উজ্জল সোনলী।

ফলন: ২.৭০-৩.৩০ টন/হেক্টর

বিজেআরআই তোষা পাট-৮ (রবি-১)

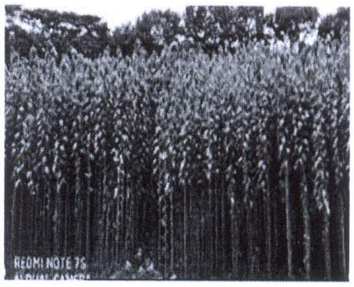

চিত্রঃ বিজেআরআই তোষ পাট-৮

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য: কান্ড মসৃণ, সিলিন্ড্রিক্যাল, লালচে এবং দ্রুত বর্ধনশীল। গাছের ছালে ফাইবার বান্ডেলের ঘনত্ব বেশী। পাতা লম্বা বর্শাফলাকৃতি এবং উপরিভাগ চকচকে। প্রতি ফলে গড়ে ২০০-২৫০ টি গাঢ় সবুজাভ নীল রঙের বীজ থাকে। প্রচলিত জাত অপেক্ষা ১৫-২০% এবং ভারতীয় জাত জেআর ও-৫২৪ অপেক্ষা ৮-১০% ফলন বেশী।

বপন সময়: মধ্য ফাল্গুন (মার্চের ১ম) হতে মধ্য বৈশাখ (এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত বীজ বপনের ভাল সময়) ।

ফলন: হেক্টর প্রতি ২.৩৫-৩.৭০ টন।

কেনাফের উন্নত জাত পরিচিতি

এইচসি-২ (জলী কেনাফ)

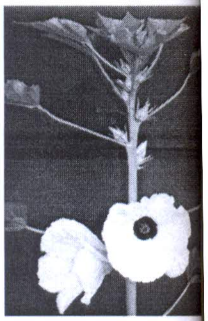

চিত্রঃ এইচসি-২ (জলী কে

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য: এ জাতের পাতা সম্পূর্ণ সবুজ, অখন্ড ও তাম্বুলাকার। জাতটি অধিক ফলনশীল ও জলাবদ্ধতা সহনশীল। নির্ধারিত সময়ে বপন করা হলে ১৫০-১৬৫ দিনের পর ফুল আসে। ফুল হালকা ক্রীম রঙের এবং ভিতরের মাঝখানে গাঢ় খয়েরী-লাল রঙের হয়। ফল গোলাকার, বীজ কালচে ধূসর রঙের তিন কোনাকৃতির এবং ১০০০ টি বীজের ওজন প্রায় ২৫ গ্রাম।

বপন সময়: চৈত্রের প্রথম থেকে মধ্য বৈশাখ (মধ্য মার্চ থেকে মধ্য এপ্রিল) পর্যন্ত সময় বপন করা যায়।

বিশেষ বৈশিষ্ট্য: উঁচু, নীচু, পাহাড়ী, চরাঞ্চল ও উপকূলীয় অঞ্চলে বপন উপযোগী। এ জাতটি জলা সহনশীল। যে সকল অনাবাদী অনুর্বর জমি ফসল উৎপাদনের উপযোগী নয় বা আউশ ফসলের জন্য লাভ নয় সে সব জমিতে কেনাফের এ জাতটি অল্প পরিচর্যায় আবাদ করেও ভাল ফলন পাওয়া যায়।

ফলন: হেক্টর প্রতি ২.৫০ - ২.৭০ টন।

এইচসি-৯৫

চিত্রঃ এইচসি-৯৫

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যঃ গাছ আকর্ষণীয় সবুজ, পাতা উজ্জ্বল সবুজ ও করতলাকৃতির এবং ৫-৭টি লোব যুক্ত। এ জাতের গাছ নির্ধারিত সময়ে বপন করা হলে ১৪০-১৭০ দিনে ফুল আসে। ফুল হালকা মাখন রঙের, ভিতরের দিকে খুব হালকা গোলাপী রঙের আভা থাকে। ফল গোলাকার, বীজ কালচে ধূসর রঙের তিন কোনাকৃতির এবং ১০০০টি বীজের ওজন প্রায় ২৫ গ্রাম। ।

বপন সময়ঃ জাতটি চৈত্রের প্রথম থেকে মধ্য বৈশাখ পর্যন্ত সময় বপন করা যায়।

বিশেষ বৈশিষ্ট্যঃ উঁচু, নীচু, পাহাড়ী, চরাঞ্চ্চল ও উপকূলীয় অঞ্চলে বপন উপযোগী।

এ জাতটি জলাবদ্ধতা সহনশীল এবং এইচসি-২ এর চেয়ে অধিক বায়োমাস উৎপাদনের সক্ষম ফলে কা মন্ড তৈরীতে বেশী উপযোগী।

ফলনঃ হেক্টর প্রতি ২.৮০ - ৩.৩০ টন ।

বিজেআরআই কেনাফ-৩ (বট কেনাফ)

চিত্রঃ বিজেআরআই কে

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য: এ গাছের কান্ড সবুজ, গাছের আগার দিকে অপেক্ষাকৃত মোটা ও অনেক পত্রল উপপত্র থাকে। সূর্য্যের আলোতে পরিনত অবস্থায় কান্ড হালকা তামাটে রং ধারণ করতে পারে। জলাবদ্ধতা সহনশীল এ জাতটির কান্ড, পাতা ও ফলে অল্প কাটা ও রোম থাকে। পাতা অখন্ড গোলাকার বট পাতার ন্যায়। ফুল হালকা ক্রীম রঙের এবং ভিতরের মাঝখানে গাঢ় খয়েরী-লাল রঙের হয়। বীজ কালচে ধূসর রঙের তিন কোনাকৃতির এবং ১০০০টি বীজের ওজন প্রায় ২৫ গ্রাম।

বপন সময়: জাতটি চৈত্রের প্রথম থেকে মধ্য বৈশাখ পর্যন্ত সময় বপন করা যায়।

ফলন: হেক্টর প্রতি ২.৬০ - ৩.০০ টন

বিজেআরআই কেনাফ-৪ (লাল কেনাফ)

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য: এ জাতটি দ্রুত বর্ধনশীল, অধিক ফলনশীল ও জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু, অধিক বায়োমাস সম্পন্ন এবং তে-ফসলী শস্যক্রমের জন্য খুব উপযোগী। কান্ড লাল, পাতার রঙ খয়েরি সবুজ ও করতলাকৃতি এবং পাতার বোঁটার উপরিভাগ লাল রঙের। এ জাতের গাছ নির্ধারিত সময়ে বপন করা হলে ১৪০-১৬০ দিন বয়সে ফুল আসে। ফুল হালকা ক্রীম রঙের এবং ভিতরের মাঝখানে গাঢ় খয়েরী-লাল রঙের হয়। ফল গোলাকার, বীজ কালচে ধূসর রঙের তিন কোনাকৃতির এবং ১০০০টি বীজের ওজন প্রায় ২৫ গ্রাম।

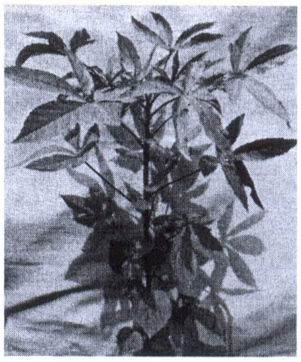

চিত্রঃ বিজেআরআই কেনাফ-৪

বপন সময়: জাতটি ১ চৈত্র থেকে বৈশাখের শেষ সময় পর্যন্ত বপন করা যায়। তবে উত্তম সময় ১৫ বৈশাখ পর্যন্ত।

ফলন: হেক্টর প্রতি ২.৮০ - ৩.৩০ টন ।

মেস্তার উন্নত জাত পরিচিতি

এইচএস-২৪ (টানি মেস্তা)

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য: এ গাছের কান্ড গাঢ় কালচে সবুজ, প্রতিটি পর্বের গোড়ায় চমৎকার লালচে বেগুনী ছোপ, কান্ডের গায়ে ঘন রোম আছে। পাতা করতলাকৃতির গাঢ় সবুজ।

ফুল আসার সময়কাল বপনের ১৮০-২১০ দিন পর। ফুল হালকা হলদে রঙের, ভিতরে মাঝখানে লালচে খয়েরী রং। মেস্তার ফল ডিম্বাকৃতি ও শীর্ষভাগ সরু। ফলের রং লালচে দাগ সহ হালকা সবুজ। বীজ কিডনী আকারের ও খয়েরী রঙের এবং ১০০০টি বীজের ওজন প্রায় ২০ গ্রাম। অর্থাৎ কেনাফের চেয়ে বীজ আকারে ছোট।

চিত্রঃ এইচএস-২৪

বপন সময়: ১ চৈত্র থেকে বৈশাখের শেষ পর্যন্ত সময় বপন করা যায়। তবে উত্তম সময় ১৫ বৈশাখ পর্যন্ত।

ফলন: হেক্টর প্রতি ২.৪০ - ২.৭০ টন।

বিজেআরআই মেস্তা-৩ (সামু-৯৩)

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য: গাছ লম্বা, সম্পূর্ণ মসৃণ ও দ্রুত বর্ধনশীল। কান্ড সবুজ এবং পাতা গাঢ় সবুজ ও করতলাকৃতির। এ জাতের শিকড় মাটির গভীরে যায় বলে এ জাত খরা সহিষ্ণু। বপনের ১৮০-২১০ দিন পর ফুল আসে তবে আঁশের জন্য ১২০ দিন বয়সে কর্তন করা যায়। ফুল ক্রীম রঙের। ফল ডিম্বাকৃতি ও মসৃণ। বীজ খয়েরী রঙের ত্রিকোণাকৃতির এবং ১০০০ টি বীজের ওজন প্রায় ২০ গ্রাম।

বপন সময়: জাতটি ১লা চৈত্র থেকে বৈশাখের শেষ পর্যন্ত বপন করা যায়। তবে উত্তম সময় ১৫ বৈশাখ পর্যন্ত।

ফলন: হেক্টর প্রতি ২.৫০ - ২.৮০ টন।

পাট, কেনাফ ও মেস্তা ফসলের আধুনিক চাষ পদ্ধতি

উফশী পাট, কেনাফ ও মেস্তার জাত ব্যবহার করলেই কেবল ভাল ফলন আশা করা যায় না। বেশি ফ হলে গাছের প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদান সরবরাহ, সঠিক ব্যবস্থাপনা ও উপযুক্ত পরিবেশের যোগান দে প্রয়োজন। পাট এবং পাট জাতীয় ফসল চাষে কৃষকরা সাধারণত বীজ বপন, সার ও সেচ প্রয়োগ, নিড়া পাতলা করণ, কীটনাশক প্রয়োগ ইত্যাদি সময়মত ও প্রয়োজনীয় মাত্রায় ব্যবহার করে না।

উফশী পাট এবং এ জাতীয় ফসলের উপযুক্ত ফলন পেতে হলে জাত নির্বাচন থেকে শুরু করে ফসল কা শুকানো, সংরক্ষণ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে ফসলের পরিচর্যা করে যেতে হয়। একটি কথা মনে রাখতে হ বীজ ফসল নয় বরং আঁশ ফসল। সাধারণত ১২০ দিন বয়সের গাছের প্রতিটি দিন এর আঁশের মান ও বৃদ্ধিতে ভুমিকা রাখে। সে কারণে এর চাষাবাদের প্রতিটি দিনের ভুমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

বীজ সংগ্রহঃ

উফশী মানে উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ নামে হলেই হবে না, বীজের মান ঠিক থাকতে হবে। ভাল এবং ফসল পেতে হলে রোগমুক্ত, পরিস্কার ও পরিপুষ্ট বীজ ব্যবহার করা উচিত। বীজের অংকুরোদগম হার এ ঠিক না থাকলে প্রচলিত ধ্যান ধারণার আলোকে কেউ কেউ অধিক পরিমাণ বীজ বপন করে ঐ ক্ষতি নেয়ার চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু মান সম্পন্ন বীজ ব্যবহার না করে অধিক পরিমাণ নিম্নমানের বীজ বপ পর্যাপ্ত গাছ পাওয়া যায় না। অধিকন্ত নিম্নমানের বীজ থেকে রোগ বালাই সহজেই অন্য চারাগাছ আক্র ফসলের ক্ষতি করে থাকে। বীজের মান নিশ্চিত হওয়ার জন্য এর পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

বীজের অংকুরোদগম পরীক্ষাঃ

বীজ বপন করার আগে বীজের ভালো মন্দ বিশেষত অংকুরোদগম ক্ষমতা পরীক্ষা করে নেয়া প্রয়ো সহজে এবং অল্প খরচে এ কাজ করা যায়। প্রথমে বীজের পাত্র থেকে ১০০টি বীজ গুনে নিয়ে একটি সানকিতে একপরত ভেজা কাপড় বা চোষ কাগজ বা তা না থাকলে খবরের কাগজ (নিউজপ্রিন্ট) ২/ বিছিয়ে পানি দিয়ে ভাল করে ভিজিয়ে নিয়ে তার উপর ঐ ১০০টি বীজ সুন্দর করে ছড়িয়ে দিতে হবে। তলায় যে জায়গা থাকে তাই ১০০টি বীজ ছড়ানোর জন্য যথেষ্ট, পাশে ছড়াতে হয় না। এবার আর একটি বা সরা দিয়ে ঐ বীজওয়ালা সানকি ঢেকে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সানকির কাপড় বা কাগজ না যায় অথবা বীজ পানিতে ডুবে না যায়। সে জন্য শুকিয়ে গেলে দরকার মত পানি ছিটিয়ে দিতে হ বসানোর তিন দিন পর শতকরা ৮০ টির অধিক বীজ গজালে তাকে ভাল মানের বীজ বলা যেতে পা শতকরা ৭০ টির অধিক কিন্তু ৮০ টির কম বীজ গজায় তাহলে বীজ বপনের সময় বীজের অংকুরে অনুপাতে পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে বপন করতে হবে। শতকরা ৭০ টির কম বীজ গজালে ঐ বীজ বপন ন ভাল।

জমি নির্বাচনঃ

বেলে দো-আঁশ থেকে দো-আঁশ ধরণের যে কোন মাটি পাট, কেনাফ ও মেস্তা চাষের উপযোগী। কিন্তু ক ভাল ফলন পেতে হলে জাতের ধরণ বুঝে জমি নির্বাচন করতে হবে যেমন তোষা বা ধবধবে সাদা আঁ

দেশী পাট জাতের জন্য বিশেষ করে যে সকল জমি মৌসুমের প্রথমে বৃষ্টির পানিতে জলাবদ্ধ না হয় এবং বৃষ্টির পানি দ্রুত নিষ্কাশনের সুবিধা রয়েছে এমন জমি নির্বাচন করতে হবে। তাছাড়া বাগানের আশে পাশে বা বসত বাড়ীর পাশের জমিতে ফলন ভাল হয় না। কারণ এ ধরণের জমিতে রোগ-বালাই হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে, বিশেষ করে ছত্রাক জনিত রোগ এবং কীট পতঙ্গের আক্রমণ। অবশ্য এ সকল জমিতে অন্য ফসল না হলে কেনাফ চাষ করা যেতে পারে। মেস্তার জন্য একটু টান বা উঁচু জমি নির্বাচন করা প্রয়োজন।

জমি তৈরীঃ

বীজের আকার যত ছোট হয় মাটি তত মিহি করে প্রস্তুত করতে হয়। সে বিবেচনায় পাটের বীজ খুব ছোট বলে পাট ফসলের জমি মিহি করে চাষ দিতে হয়। পাট গাছ চারমাস ব্যাপী বৃদ্ধি পায় এবং ৩-৪ মিটার উচু হয় এ জন্য জমি গভীর করে চাষ দেয়া প্রয়োজন। ট্রাক্টর/পাওয়ার টিলার-এর সাহায্যে জমি গভীর করে চাষ দেয়া যায়। এপাশ-ওপাশ করে ৫-৬ বা প্রয়োজনে তারও অধিক বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চাষ দেয়া যেতে পারে। পাট চাষের জন্য খরচ কমাতে হলে যে সকল জমিতে আলু বা সবজি চাষ করা হয়েছে সে সকল জমিতে একবার চাষ ও মই দিয়ে বীজ বপন করেও ভাল ফলন পাওয়া যায়। এসব জমিতে নিড়ানী খরচও কম হয়। সারি করে সীড ড্রিলের (বীজ বপন যন্ত্র) সাহায্যে বীজ বপন করলে বীজগুলো মাটির নীচে সমান গভীরতায় পড়ে এবং সমভাবে অংকুরোদগম হয়। সারিতে বপনকৃত মাঠের পরবর্তি পরিচর্যা সহজতর ও ব্যয় সাশ্রয়ী হয়।

সার প্রয়োগঃ

অন্যান্য ফসলের মত পাট ফসলেও যথোপযুক্ত সার পরিমিত মাত্রায় উপযুক্ত সময়ে প্রয়োগ করে আঁশের ফলন ও মান যথেষ্ট বাড়ানো সম্ভব। পাট গাছের দৈহিক বৃদ্ধি এবং আঁশের ফলন বাড়ানোর ক্ষেত্রে নাইট্রোজেন সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ উপাদান। ফসফরাস ও পটাশিয়ামের ভুমিকা নাইট্রোজেনের মত গুরুত্বপূর্ণ না হলেও এদের প্রয়োজনীয়তাও কম নয়। ফসফরাস আঁশের গুণগত মান উন্নত করে। পটাশ সার পাট গাছের রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়ায়। পটাশিয়াম সার উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবহারে অন্যান্য সারের মিথস্ক্রিয়ায় হেক্টর প্রতি অতিরিক্ত ১০০ কেজি (প্রতি একরে প্রায় ১ মণ) আঁশ উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। লক্ষ্য করা গেছে যে, ফসফেট (টিএসপি) এবং পটাশ (মিউরেট অব পটাশ) সারের একবার প্রয়োগ এবং নাইট্রোজেন এর দুবার পৃথক প্রয়োগ পাট চাষের জন্য লাভজনক। বাংলাদেশের অনেক পাট চাষের জমিতে সালফার এবং জিংক প্রয়োগ করেও ভাল ফল পাওয়া যায়।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট বিভিন্ন অঞ্চলের মাটি পরীক্ষা করে এবং আঞ্চলিক কেন্দ্রসমুহে পরীক্ষণ স্থাপন করে তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাট চাষের জন্য জাতভিত্তিক একটি সার প্রয়োগ মাত্রা অনুমোদন করেছে (সারণি ৩)

সারণি ৩: মধ্যম মৃত্তিকা উর্বরতায় এবং মধ্যম উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রায় পাট, কেনাফ ও মেস্তার জাত উৎপাদনে **জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগের সময় এবং পরিমাণ** (কেজি/হেক্টর)

জাত	গোবর সারের পরিমাণ	প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সারের মাত্রা এবং প্রয়ো				
		ইউরিয়া		টিএসপি	এমপি	জিপসা
	বপনের ২-৩ সপ্তাহ পুর্বে	বপনের দিন	বপনের ৪৫ দিন পর	বপনের দিন		
দেশী জাতঃ সিভিএল-১, সিসি -৪৫, সিভিই-৩, বিজেআরআই দেশী পাট-৫ ও ৬ তোষা জাতঃ ও-৪, বিজেআরআই তোষা পাট-৮	*	৮০	৮০	২৫	৩০	৪৫
তোষা জাতঃ ও-৯৮৯৭	*	১০০	১০০	৫০	৬০	৯৫
তোষা জাতঃ ওএম-১	*	৯০	৯০	৫০	৪০	৯৫
বিজেআরআই তোষা পাট-৪	*	৮৫	৮৫	৫০	৪০	৯৫
কেনাফ জাতঃ এইচসি-২ এবং এইচসি-৯৫	*	৬৫	৬৫	২৫	৩০	-
মেস্তা জাতঃ এইচএস-২৪	*	৫৫	৫৫	২৫	-	-
দেশী জাতঃ সিভিএল-১, সিসি -৪৫, সিভিই-৩, বিজেআরআই দেশী পাট-৫ ও ৬ তোষা জাতঃ ও-৪, বিজেআরআই তোষা পাট-৮	৫০০	২৫	৯০	-	-	-
তোষা জাতঃ ও-৯৮৯৭	৫০০০	৪৫	১০০	-	১০	৫০
তোষা জাতঃ ওএম-১	৫০০০	৩৫	৯০	-	-	৫০
বিজেআরআই তোষা পাট-৪	৫০০০	৬০	৬০		১০	৫০
কেনাফ জাতঃ এইচসি-২ এবং এইচসি-৯৫	৫০০০	১২	৬৫	-	-	-
মেস্তা জাতঃ এইচএস-২৪	৫০০০	-	৫৫	-	-	-

নোটঃ * গোবর সার ব্যবহার না করা অবস্থায়

সার প্রয়োগ পদ্ধতিঃ

- গোবর সার অবশ্যই বীজ বপনের ২-৩ সপ্তাহ পুর্বে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।
- প্রয়োগকৃত গোবর সার চাষ ও মই দিয়ে মাটির সাথে ভাল করে মিশিয়ে দিতে হবে।
- বীজ বপনের দিন প্রয়োজনীয় পরিমাণের অর্ধেক ইউরিয়া, সম্পূর্ণ মাত্রার টিএসপি, এমপি, জিপ জিংক সালফেট সার জমিতে শেষ চাষে প্রয়োগ করে মই দিয়ে মাটির সাথে ভাল করে মিশিয়ে দি
- দ্বিতীয় কিস্তি ইউরিয়া সার প্রয়োগের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন মাটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ রস থাকে
- দ্বিতীয় কিস্তির ইউরিয়া সার কিছু শুকনা মাটির সাথে মিশিয়ে জমিতে প্রয়োগ করা ভাল।
- প্রয়োগকৃত ইউরিয়া সার হো যন্ত্রের সাহায্যে অথবা প্রচলিত নিড়ানীর সাহায্যে ভাল করে জমিতে দিতে হবে।
- ইউরিয়া সার প্রয়োগের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন প্রয়োগকৃত সার গাছের কচি পাতা এবং ডগায় থাকে।

বীজের হার, বপন ও গাছের ঘনত্বঃ

প্রচলিত এবং জনপ্রিয় পদ্ধতি হচ্ছে ছিটিয়ে বীজ বপন করা। অধিক (প্রায় ১০০%) বিশুদ্ধ এবং সতেজ বীজ সংগ্রহ করে বপন করতে হবে। বর্তমানে পাট, কেনাফ ও মেস্তা বীজ বপনের হার নিম্নরূপ নির্ধারিত হয়েছে।

জাত	বীজের হার (কেজি)/হেক্টর
দেশী	৭.০০-৮.০০
তোষা	৫.০০-৬.০০
কেনাফ	১১.০০-১২.০০
মেস্তা	১১.০০-১২.০০

নোটঃ বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ৮০ শতাংশের বেশী হতে হবে

পাট, কেনাফ ও মেস্তার অধিকাংশ জমির এখনও বীজ ছিটিয়ে বপন করা হয়। এতে জমিতে গাছের ঘনত্ব সব জায়গায় সমান থাকে না, ফলে কোন গাছ মোটা, কোন গাছ চিকন ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। একরে কমপক্ষে ১.৫০ লক্ষ বা হেক্টরে ৪.০০ লক্ষ গাছ থাকা বাঞ্চনীয়। সারিতে বপন করা আপাতদৃষ্টে কষ্টসাধ্য মনে হলেও এর উপকারিতা সম্পর্কে অনেকেই জ্ঞাত নন। প্রথমত এর ফলে জমির সর্বত্র গাছের বিস্তৃতি সমভাবে থাকে। দ্বিতীয়ত পরিচর্যার সুবিধা হয়। সারিতে বপন করা হলে বীজের পরিমাণ কম লাগে এবং অধিকাংশ বীজ গজিয়ে থাকে। এর ফলে জমিতে নির্ধারিত সংখ্যক গাছ রাখা সহজতর হয়। সারি থেকে সারির দুরত্ব ৩০ সেন্টিমিটার এবং সারিতে গাছ থেকে গাছের দুরত্ব ৫-৬ সেন্টিমিটার হলে ভাল হয়।

নিড়ানী ও চারা পাতলাকরণঃ

বাংলাদেশের পাট ক্ষেতে ১২৯ টি প্রজাতির উদ্ভিদ আগাছা হিসেবে জন্মে এদের প্রায় সবই দ্বিবীজ পত্রী, মাত্র ৭টি প্রজাতি একবীজ পত্রী। এদের মধ্যে ২৭টি আগাছা খুবই গুরুত্বপুর্ণ এরা ফসলের সর্বোচ্চ ক্ষতি সাধন করে। পাটের চাষে যে খরচ হয় তার একটা বড় অংশই নিড়ানী ও অন্যান্য পরিচর্যার জন্য হয়ে থাকে। সেদিক দিয়ে জমি নির্বাচন খুব গুরুত্বপুর্ণ। ফসলক্রম অনুসরণ করেও অনেক আগাছা দমন করা যায় যেমন আলু ক্ষেতে পাট বীজ বপন করা হলে চাষাবাদ এবং নিড়ানী দুটোর খরচই প্রায় বেঁচে যায়।

পাট গাছের বয়স ৪০-৫০ দিনের মধ্যে একবার নিড়ানী দেয়ার সময় কৃষকগণ সাধারণত চারা পাতলা করে থাকেন। তবে পাট ক্ষেতে ৭০-৯০ দিনের বয়সে যে গাছ পাতলা করা হয় তা টানা বাছ নামে পরিচিত। এ টানা বাছ থেকে পাওয়া গাছ পচিয়ে খুব উন্নত মানের পাট আঁশ পাওয়া যায়। পাট গাছের প্রতিটি দিন যেহেতু বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপুর্ণ, তাই নিড়ানী ও চারা পাতলাকরণে অবহেলা করলে গাছের বৃদ্ধির যে ক্ষতি হয় তা কোন ভাবেই পূরণ হয় না, ফলে ফলন কমে যায় । কেনাফ খুব ঘন পাতা বিশিষ্ট হওয়ায় একবার চারা গজিয়ে উঠতে পারলে আর নিড়ানী দেয়ার প্রয়োজন হয় না। চারা গজানোর ১৫-২০ দিনের মধ্যে চারা পাতলা করা প্রয়োজন। নয়তো অতিরিক্ত প্রতিযোগিতার চাপে কোন চারাই ভাল ভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে না। সারিতে বা ছিটিয়ে বপন করার ক্ষেতেও প্রাথমিক পর্যায়ে আঁচড়া দিয়ে চারা পাতলা করা যায়।

পাট শাক উৎপাদন কলাকৌশল

ভূমিকাঃ

পাট মূলতঃ আঁশ ফসল। তোষা ও দেশি এ দুই জাতের পাটই আমাদের দেশে বাণিজ্যিকভাবে চাষ হয় ধরে বাংলার ঘরে ঘরে পাটের কচি পাতা শাক হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে। আফ্রিকা, মধ্য-পূর্ব ও দ এশিয়াতেও পাট পাতা ঔষধি হিসেবে দীর্ঘ দিন যাবৎ ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে প্রচুর পরিমান ভিটামিন, ক ক্যালসিয়াম, পাটসিয়াম ও আঁশ বিদ্যমান। পাট পাতায় ফাইটল ও মনোগ্যালাকটোসিল ডাইঅ্যাসাইল বিদ্যমান যা ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়তা করে। পাট পাতার রস অম্লনাশক, বাত নিরোধক, ক্ষুধা বৃ আমাশয়, উদারাময় ইত্যাদি রোগের মহৌষধ। তাছাড়া ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, আলসার প্রতিরোধক, ক্ষয়রোগ, রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করার মত অনেক গুণাবলী রয়েছে পাট পাতায়। এতে আরে প্রচুর পরিমাণ এন্টি-অক্সিডেন্ট যা শরীরকে সতেজ রাখে এবং দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে পাট শাক বিভিন্ন ঔষধি গুণে সমৃদ্ধ বিধায় আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় সংযুক্ত করা অতি আবশ্যক

পাট শাকের জাতের পরিচিতি

বিজেআরআই পাট শাকের ৩ টি জাত উদ্ভাবন করেছে যা চাষ করে প্রায় সারা বছরই শাক পাওয় জাতসমূহ যথাক্রমে ১) বিজেআরআই দেশি পাট শাক-১ (বিজেসি-৩৯০), ২) বিজেআরআই দে শাক-২ (ম্যাড়া লাল), ৩) বিজেআরআই দেশী পাট শাক-৩ (ম্যাড়া সবুজ)।

বিজেআরআই দেশি পাট শাক-১ (বিজেসি-৩৯০)

উদ্ভাবনের ইতিহাসঃ

চিত্রঃ বিজেআরআই দেশী পাট শ

দেশি পাটের একটি অগ্রবর্তি সারি (খাট লাল দেশি পাট) এর সাথে বিনা পাট শাক-১ এর শংকরায়নের মাধ্যমে বেশী পাতা বিশিষ্ট ও মিষ্টি স্বাদযুক্ত (সাধারণত দেশি পাট তিতা স্বাদযুক্ত) এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। জাতটি সমগ্র বাংলাদেশেই বপন উপযোগী। এছাড়া জাতটিতে আমিষ, আঁশ, অ্যাশ, কার্বোহাইড্রেট এবং প্রচুর পরিমানে ক্যারোটিন (ভিটামিন-সি) বিদ্যমান। জাতীয় বীজ বোর্ড গত ২০১৪ সালে এ লাইনটি পাট শাক হিসেবে সমগ্র বাংলাদেশে চাষের জন্য 'বিজেআরআই দেশি পাট শাক-১' নামে নিবন্ধন দিয়েছে

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যঃ

এ জাতের পাতা ডিম্ব-বর্শাফলাকৃতির। গাছ খর্বাকৃতির এবং সম্পূর্ণ সবুজ। পাতা মিষ্টি স্বাদযুক্ত।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যঃ

স্বল্প মেয়াদি জাত। পাতা গাঢ় সবুজ রং এর। গাছে পাতার সংখ্যা স্বাভাবিক জাতের চেয়ে অনেক বেশী। গ খাট ফলে এ জাত থেকে কোন আঁশ পাওয়া যাবে না।

বিজেআরআই দেশি পাট শাক-১ এর প্যারেন্টদের সাথে রাসায়নিক উপাদান-এর তুলনাঃ

বিভিন্ন উপাদান	বিজেআরআই দেশি পাট শাক-১	বিনা পাট শাক-১	লাল খাটো দেশি
আর্দ্রতা (গ্রাম/১০০ গ্রাম)	৭৬.৬৬	৭৭.৬৭	৭৮.৬১
অ্যাশ (গ্রাম/১০০ গ্রাম)	১.৮৫	১.৭৮	১.৬৮
লিপিড (গ্রাম/১০০ গ্রাম)	০.১৩	০.১৭	০.১৫
প্রোটিন (গ্রাম/১০০ গ্রাম)	২.৬৩	২.৬৮	২.৩৭
আঁশ (গ্রাম/১০০ গ্রাম)	১.৩৯	১.৩৪	১.২১
কার্বোহাইড্রেট (গ্রাম/১০০ গ্রাম)	১৭.৩৪	১৬.৩৬	১৫.৯৯
ভিটামিন-সি (মি.গ্রা./১০০ গ্রাম)	০.০০৩১	০.০০২২	০.০০৩৪
ক্যারোটিনয়েড (মা.গ্রা./১০০ গ্রাম)	১৪২২৫.৫৫	১১৩৮১.১৭	১৪৫৮৪.৬৫

চাষ উপযোগী জমিঃ

পলি দো-আঁশ, বেলে দো-আঁশ ও এটেল দো-আঁশ মাটি এ জাতের জন্য উপযোগী। বাংলাদেশের প্রায় সব এলাকাতে এর চাষ করা যায়। বাড়ীর আঙ্গীনা এমন কি বাড়ীর ছাদেও এ শাকের চাষ করা যায়।

বপনকালঃ

এ জাতটি ফাল্গুনের মাঝামাঝি থেকে ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি (ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ থেকে আগস্ট মাস) পর্যন্ত বপন করা যায়। তবে বীজের জন্য শ্রাবণ মাসে বপন করা ভাল।

জমি তৈরী ও বীজ বপনঃ

প্রকার ভেদে জমি আড়া আড়িভাবে ৩-৫ বার এবং প্রয়োজনে আরো বেশী চাষের পর ২-৩ বার মই দিয়ে জমির মাটি মিহি করে প্রস্তুত এবং আগাছা পরিস্কার করে বীজ বপন করতে হবে। ছিটিয়ে বা সারিতে উভয়ভাবেই বীজ বপন করা যায়। সারিতে বপনের ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সে.মি. এবং সারিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৫-৬ সে.মি. হওয়া উচিত। সারিতে বপন করলে গাছের পরিচর্যা সহজতর হয় এবং এতে শাকের ফলনও বেশী পাওয়া যায়।

বীজের পরিমাণঃ

ছিটিয়ে বপনের ক্ষেত্রে হেক্টর প্রতি ৮-১০ কেজি এবং সারিতে বপন করলে হেক্টর প্রতি ৬-৭ কেজি বীজ প্রয়োজন হয়।

সারের পরিমাণঃ

শাকের জমি তৈরীর সময় হেক্টর প্রতি ৪-৫ টন গোবর সার প্রয়োগ করা খুবই প্রয়োজন। গোবর সার প্রয়োগ করলে রাসায়নিক সার ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না। তবে গোবর সার ব্যবহার না করলে হেক্টর প্রতি ৬৬ কেজি ইউরিয়া, ২৫ কেজি টিএসপি এবং ৪০ কেজি এমওপি সার জমি তৈরী সময় প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম বার শাক উত্তোলন করে পরবর্তিতে শাক পেতে অবশিষ্ট গাছের বয়স ৪৫ দিন হলে হেক্টর প্রতি ৬৬ কেজি ইউরিয়া সার

উপরি প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগ করে তা নিড়ি দিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। সারের মাত্
উর্বরতার উপর নির্ভর করে।

পরিচর্যাঃ

- বীজ বপনের ১-২ সপ্তাহ পর জমির জোঁ অনুযায়ী আঁচড়া বা নিড়ি দিয়ে চারা পাতলা করে দিতে হবে।
- গাছের বয়স ৩০-৩৫ দিন হলে নিড়ানী দিয়ে আগাছা পরিস্কার এবং দুর্বল ও চিকন গাছ তুলে ফেলতে
- সাধারণতঃ এ জাতে পাটশাকে তেমন কোন রোগ-পোকার আক্রমন দেখা যায় না। শাকে কো কীটনাশক ব্যবহার করা উচিত নয়।

শাক সংগ্রহঃ

গাছের বয়স ৩৫-৪৫ দিনের মধ্যে হলেই শাক খাওয়ার উপযোগী হয়। প্রথমে গাছ তুলে এবং পরবর্তি সংখ্যা কমে গেলে গাছের ডগা ছিঁড়ে শাক খাওয়া যেতে পারে। ডগা তুলার বা খাওয়ার কিছু দিন পর শা থেকে কচি পাতা বের হলে তাও শাক হিসেবে খাওয়া যাবে। এ ভাবে অনেকবার শাক সংগ্রহ করা সম্ভ একবার চাষ করে তা থেকে দীর্ঘ কয়েক মাস অনায়াসে শাক সংগ্রহ করা যায়। বাড়ীর আঙ্গীনা বা ছা শাক চাষ করে ছোট পরিবারের চাহিদা পূরণ করা যায়।

ফলনঃ

শাক পাতার ফলন প্রায় ৩.০০-৩.৫০ টন/হেক্টর বা বিঘা প্রতি ১১-১৩ মণ।

বীজ উৎপাদনঃ

বীজ উৎপাদনের জন্য কোন বিশেষ কৌশলের প্রয়োজন হয় না। স্ব-পরাগায়িত ফসল হওয়ায় বীজ কোন প্রকার সমস্যা নেই। এপ্রিল থেকে আগস্ট মাসের (চৈত্রের ৩য় সপ্তাহ থেকে ভাদ্রের মাঝা মাঝি) প উঁচু জমিতে বীজ বপন করে ভাল বীজ পাওয়া যায়। বীজ ভাল ভাবে শুকিয়ে বায়ুরোধী পাত্রে সংরক্ষণ বছর ব্যবহার করা যায়।

বিজেআরআই দেশী পাট শাক-২ (ম্যাড়া লাল)

উদ্ভাবনের ইতিহাসঃ

ম্যাড়াশাক (লাল), বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের কৃষকের নিকট থেকে সংগ্রহ করে বিশুদ্ধ সারি নির্বাচনের মাধ্যমে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এটি বাংলাদেশে সর্বত্র চাষ উপযোগী।

চিত্রঃ বিজেআরআই দেশী পাট

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যঃ

এ জাতের পাতা ডিম্ব-বর্শাফলাকৃতির তবে বিজেআরআই দেশি পাট শাক-১ এর তুলনায় ছোট। গাছের কান্ড, পাতার বোঁটা ও শিরা গাঢ় লাল। পাতা মিষ্টি স্বাদযুক্ত এবং গাছ খর্বাকৃতির। এ জাত থেকে আঁশ পাওয়া যাবে না।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যঃ

স্বল্প মেয়াদী জাত, গাছ সম্পূর্ণ লাল, পাতা গাঢ় সবুজ রং-এর। এ জাতের 'ক্যানোপি' কম হওয়ায় একক জায়গায় অধিক সংখ্যক গাছ থাকতে পারে। বপনের সময় ভেদে এ জাতে ৪৫-৫০ দিনের মধ্যে ফুল আসে এবং ৭৫-৯০ দিনের মধ্যে বীজ পাওয়া যায়।

পুষ্টিমানঃ

বিজেআরআই দেশি পাট শাক-১ এর সাথে তুল্য জাতের পুষ্টিমানের তুলনা

পুষ্টি উপাদানসমূহ	বিজেআরআই দেশি পাট শাক-২	বিজেআরআই দেশি পাট শাক-১	বিনা পাট শাক-১
আদ্রতা (%)	৮৫.০৪	৮৪.০৮	৮০.৬৩
আমিষ (%)	১৮.৪৫	২২.৬৬	২২.৮৩
অ্যাশ (%)	৭.৭৭	৮.৫৮	৫.৬৯
বিটাকেরোটিন (µg/g)	১২৫.৪০	১১৫.৮০	৯৫.৫৯
ভিটামিন-সি (mg/100g)	৭৪.৫৩	৬৭.৭৩	৬৩.৮৫
ক্যালসিয়াম (%)	২.৩৬	১.৬২	১.৯১
পটাসিয়াম (%)	১.৬১	১.৭৫	১.৩৯
সোডিয়াম (%)	০.১২৫	০.১১১	০.০৯১
ফসফরাস (%)	০.৬২০	০.৬৫৪	০.৬৩৬
আয়রন (ppm)	৯৭১	৯৯৩	১৩৪৪

বিজেআরআই দেশী পাট শাক-৩ (ম্যাড়া সবুজ)

উদ্ভাবনের ইতিহাসঃ

ম্যাড়াশাক (সবুজ), বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের কৃষকের নিকট থেকে সংগ্রহ করে বিশুদ্ধ সারি নির্বাচনের মাধ্যমে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এটি বাংলাদেশে সর্বত্র চাষ উপযোগী।

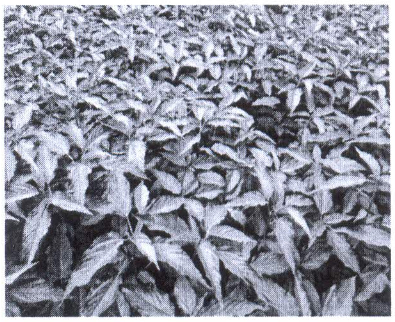

চিত্রঃ বিজেআরআই দেশী পাট শাক-৩

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যঃ

এ জাতের পাতা ডিম্ব-বর্শাফলাকৃতির তবে বিজেআরআই দেশি পাট শাক-১ -এর তুলনায় ছোট। গাছের কান্ড, পাতার বোঁটা ও শিরা গাঢ় সবুজ। পাতা মিষ্টি স্বাদযুক্ত এবং গাছ খর্বাকৃতির। এ জাত থেকে আঁশ পাওয়া যাবে না।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যঃ

স্বল্প মেয়াদী জাত, গাছ সম্পূর্ণ সবুজ, পাতা গাঢ় সবুজ রং-এর। এ জাতের 'ক্যানোপি' কম হওয়ায় একক জায়গায় অধিক সংখ্যক গাছ থাকতে পারে। গাছের বয়স ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে হলেই শাক সংগ্রহ করা যায়। বপনের সময় ভেদে এ জাতে ৪৫-৫০ দিনের মধ্যে ফুল আসে এবং ৭৫-৯০ দিনের মধ্যে বীজ পাওয়া যায়।

পুষ্টিমানঃ

বিজেআরআই দেশি পাট শাক-১ এর সাথে তুল্য জাতের পুষ্টিমানের তুলনা

পুষ্টি উপাদানসমূহ	বিজেআরআই দেশি পাট শাক-২	বিজেআরআই দেশি পাট শাক-১	বিনা পাট শা
আদ্রতা (%)	৮৫.০৪	৮৪.০৮	৮০.৬৩
আমিষ (%)	১৮.৪৫	২২.৬৬	২২.৮৩
অ্যাশ (%)	৭.৭৭	৮.৫৮	৫.৬৯
বিটাকেরোটিন (µg/g)	১২৫.৪০	১১৫.৮০	৯৫.৫৯
ভিটামিন-সি (mg/100g)	৭৪.৫৩	৬৭.৭৩	৬৩.৮৫
ক্যালসিয়াম (%)	১.৯৩	১.৬২	১.৯১
পটাসিয়াম (%)	১.৬৭	১.৭৫	১.৩৯
সোডিয়াম (%)	০.১১৮	০.১১১	০.০৯১
ফসফরাস (%)	০.৫৮৮	০.৬৫৪	০.৬৩৬
আয়রন (ppm)	৬১০	৯৯৩	১৩৪৪

বিজেআরআই দেশী পাট শাক-২ (ম্যাড়া লাল) ও ৩ (ম্যাড়া সবুজ) এর চাষ পদ্ধতি

বপন সময়ঃ

এ জাতটি মধ্য ফেব্রুয়ারী থেকে অক্টোবর মাসের শেষ বা ফাল্গুন মাস থেকে মধ্য কার্তিক পর্যন্ত বপন করা য তবে মার্চ থেকে জুলাই এর শেষ বা মধ্য ফাল্গুন থেকে মধ্য শ্রাবণ পর্যন্ত সময়ে বপন করলে অধিক ফলন পাও যায়।

জমি তৈরী ও বীজ বপনঃ

প্রকারভেদে আড়াআড়ি ২-৩ বার চাষ ও মই দিয়ে জমির মাটি মিহি করে তৈরী করতে হবে। প্রস্তুতকৃত জমি ছিটিয়ে বা সারিতে উভয়ভাবেই বীজ বপন করা যায়। সারিতে বপন করলে সারি থেকে সারির দুরত্ব ১৫-২ সে.মি. এবং সারিতে গাছ থেকে গাছের দুরত্ব ৩-৪ সে.মি. হওয়া উচিত। সারিতে বপন করলে গাছের পরিচ করা সহজ হয় এবং ফলনও বেশী পাওয়া যায়।

বীজের পরিমানঃ

ছিটিয়ে বপন পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রতি হেক্টরে ১০-১২ কেজি এবং সারিতে বপন পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রতি হেক্টরে ৮- কেজি বীজ প্রয়োজন। তবে বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা অবশ্যই ৮০ শতাংশের বেশী হতে হবে।

সারের পরিমাণঃ

শাকের জমি তৈরীর সময় হেক্টর প্রতি ৪-৫ টন গোবর সার প্রয়োগ করা খুবই প্রয়োজন। গোবর সার প্রয়োগ কর রাসায়নিক সার ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না। তবে গোবর সার ব্যবহার না করলে হেক্টর প্রতি ৭৫ কে ইউরিয়া, ২৫ কেজি টিএসপি এবং ১৩ কেজি এমওপি সার জমি তৈরী সময় প্রয়োগ করতে হবে। বপনের ২০- দিন পর প্রথম নিড়ি দিয়ে হেক্টর প্রতি ৭৫ কেজি ইউরিয়া ছিটিয়ে দিলে শাকের ফলন ভাল হয়।

পরিচর্যাঃ

- বীজ বপনের ১-২ সপ্তাহ পর জমির জোঁ অনুযায়ী আঁচড়া বা নিড়ি দিয়ে চারা পাতলা করে দিতে হবে।
- গাছের বয়স ২০-২৫ দিন হলে নিড়ানী দিয়ে আগাছা পরিস্কার এবং দুর্বল ও চিকন গাছ তুলে ফেলতে হবে।
- সাধারণতঃ এ জাতের পাটশাকে তেমন কোন রোগ-পোকার আক্রমন দেখা যায় না। শাকে কোন প্রকার কীটনাশক ব্যবহার করা উচিত নয়।

শাক সংগ্রহঃ

গাছের বয়স ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে হলেই শাক খাওয়ার উপযোগী হয়। প্রথমে গাছ তুলে এবং পরবর্তিতে গাছের সংখ্যা কমে গেলে গাছের ডগা ছিঁড়ে শাক খাওয়া যেতে পারে। ডগা তুলার বা খাওয়ার কিছু দিন পর শাখা-প্রশাখা থেকে কচি পাতা বের হলে তাও শাক হিসেবে খাওয়া যাবে। তবে এ জাতে দ্রুতই ফুল এসে যায় বলে এক-দুই ধাপেই শাক সংগ্রহ করা যায়। বাড়ীর আঙ্গীনা বা ছাদের টবে শাক চাষ করে ছোট পরিবারের চাহিদা পূরণ করা যায়।

ফলনঃ

শাক পাতার ফলন প্রায় ৩.০০-৩.৫০ টন/হেক্টর বা বিঘা প্রতি ১১-১৩ মণ।

বীজ উৎপাদনঃ

বীজ উৎপাদনের জন্য কোন বিশেষ কৌশলের প্রয়োজন হয় না। স্ব-পরাগায়িত ফসল হওয়ায় বীজ উৎপাদনে কোন প্রকার সমস্যা নেই। এপ্রিল থেকে আগস্ট মাসের (চৈত্রের ৩য় সপ্তাহ থেকে ভাদ্রের মাঝা মাঝি) পর্যন্ত একটু উঁচু জমিতে বীজ বপন করে ভাল বীজ পাওয়া যায়। তবে শাক হিসাবে বপনকৃত ফসল হতে শাক খাওয়ার পর বীজ সংগ্রহ করা যায়। বীজ ভাল ভাবে শুকিয়ে বায়ুরোধী পাত্রে সংরক্ষণ করে ২-৩ বছর ব্যবহার করা যায়।

সবজি মেস্তার জাত পরিচিতি ও উৎপাদন কলাকৌশল

বিজেআরআই মেস্তা-২ (ভিএম-১)

উদ্ভাবনের ইতিহাসঃ

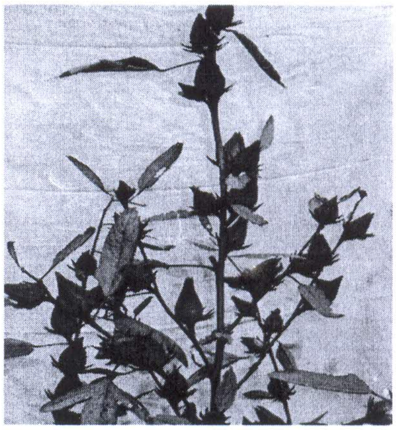
চিত্রঃ বিজেআরআই সজি মেস্তা-১

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট বন্য প্রজাতির মেস্তা, এম-৭১৫ থেকে বিশুদ্ধ সারি নির্বাচন ও গবেষণার মাধ্যমে অধিক ফলনশীল সজ্জী হিসেবে খাবার উপযোগী একটি উন্নত মেস্তার জাত উদ্ভাবন করেছে যা ভিএম-১ (চুকুর) নামে ২০১০ সালে নিবন্ধিত হয়েছে। এর পাতা ও ফলের মাংসল বৃতি (শাঁস) টক ও সুস্বাদু। রান্না করে খাওয়া যায়। পৃথিবীর অনেক দেশে মাংসল বৃতি থেকে কনফেকশনারী খাদ্য সামগ্রী যেমন-জ্যাম, জেলী, আচার, পানীয় ইত্যাদি তৈরীতে ব্যবহার করা যায়। মেস্তার ফল চুকুর হিসেবে আমাদের দেশে বেশ পরিচিত। চুকুরের পাতা ও ফলে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, কেরোটিন, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন-সি এবং অন্যান্য খাদ্য উপাদান থাকে।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যঃ

কান্ড তামাটে লাল বর্ণের এবং শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট। কান্ড ও পাতায় কোন কাঁটা থাকে না। পাতা আঙ্গুল আকৃতির (খন্ডিত), গাঢ় সবুজ, মসৃণ এবং স্বাদে টক ও সুস্বাদ। পাতার কিনারা ঢেউ খেলানো এবং পরিণত অবস্থায় তামাটে লাল। ফুল হলদে বর্ণের, ভিতরের মাঝখানে গাঢ় খয়েরী। ফলের বৃতি মাংশল যা দিয়ে জ্যাম, জেলী, চায়ের মত পানীয় ও জুস তৈরীতে ব্যবহার করা যায়। ফল ক্যাপসুল আকৃতির, উপরের দিকে চোখা ও রোম মুক্ত। বীজ কিডনী আকারের।

বপন সময়ঃ

জাতটি বৈশাখের প্রথম থেকে শ্রাবনের শেষ (এপ্রিল-জুন) পর্যন্ত সময় বপন করা যায়।

জমি তৈরী ও বীজ বপনঃ

মেস্তার বীজ আকারে বড় হওয়ায় জমি চাষ করার সময় মাটি তত মিহি না হলেও চলে। তবে এর শিকড় মাটির বেশ গভীরে প্রবেশ করে বিধায় জমি গভীরভাবে চাষ করতে হয়। জমি প্রকার ভেদে আড়া-আড়ি ভাবে ২-৩ বার চাষ ও মই দিলেই চলে। বীজ সারিতে ও ছিটিয়ে বপন করা যায়। সারিতে বপনের ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সে.মি. হওয়া উচিত। সারিতে বপনের জন্য ১০-১২ এবং ছিটিয়ে বপনের জন্য ১৭-১৮ কেজি বীজ প্রয়োজন হয়। তবে বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা >৮০ শতাংশ হলে ভাল হয়। শুষ্ক ও অনুর্বর জমিতেও এর চাষ করা যায়।

সার প্রয়োগঃ

প্রতি হেক্টর জমিতে ২.০ টন গোবর সার ব্যবহার করা উচিত। তবে গোবর সারের অভাব হলে জমির শেষ চাষের সময় ৬৫ কেজি ইউরিয়া, ২৫ কেজি টিএসপি এবং ৪০ কেজি এমওপি সার ব্যবহার করতে হবে এবং বপনের ৪৫ দিন পর ৬৫ কেজি ইউরিয়া সার উপর প্রয়োগ করতে হবে।

পরিচর্যাঃ

চারা গজানোর পর প্রয়োজন অনুসারে নিড়ানী ও গাছ পাতলা করে দিতে হবে। প্রথম দিকে যত্ন না নিলে আগাছার সাথে প্রতিযোগীতায় গিয়ে চারা গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং পরে তা সহজে পূরণ হতে চায় না। পাটের চেয়ে মেস্তা ফসলের পরিচর্যা কম লাগে। বপনের ১৩০-১৫০ দিন পর মেস্তার ফুল আসা শুরু হয়। পরবর্তিতে ফল পরিপুষ্ট হলে ফল ছিড়ে তা থেকে মাংসল বৃতি সংগ্রহ করা হয়।

ফলনঃ

হেক্টর প্রতি ২.০০-২.৫০ টন বৃতি এবং ৬.০০-৭.০০ টন পাতা পাওয়া যায়।

বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণঃ

বীজের জন্য ভাদ্র (আগস্ট-সেপ্টেম্বর) মাসে বীজ বপন করা ভাল। মেস্তার ফল পাকলে বীজ ফসল কেটে ২-৩ দিন রোদে শুকিয়ে নিলে ফলগুলো ফেটে যায়। এরপর লাঠি দিয়ে মাড়িয়ে বীজ সংগ্রহ করা যায়। তবে বর্তমানে ফল থেকে বীজ সংগ্রহের জন্য মাড়াই যন্ত্র বের হয়েছে যা দিয়ে সহজেই বীজ সংগ্রহ করা যায়। বীজ শুকানোর জন্য শুকনা মাটির উঠান বা পাকা মেঝেতে ছালা বা কাপড় বিছিয়ে তাতে বীজ শুকানোর ব্যবস্থা করতে হবে। সরাসরি পাকা মেঝেতে বীজ শুকানো উচিত নয় তাতে দ্রুত শুকাতে গিয়ে বীজের ভ্রুণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ভালভাবে শুকানো বীজ ঠান্ডা করে বায়ুরোধি পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে। এ ভাবে সংরক্ষণকৃত বীজ দুই বছর পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।

পাট, কেনাফ ও মেস্তার প্রধান প্রধান রোগ বালাই ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

পাটে সাধারণত তিন ধরনের যথাঃ ছত্রাক, ভাইরাস ও নেমাটোড জনিত রোগ হয়। ছত্রাক জনিত প্রধান রোগগুলো হলো- (১) চারা মড়ক, (২) ঢলে পড়া, (৩) কান্ড পচা, (৪) শুকনা ক্ষত, (৫) কালো পট্টি, (৬) আগা শুকিয়ে যাওয়া এবং (৭) পাতায় সাদা গুড়া পড়া। ভাইরাস জনিত প্রধান রোগ হলো- পাতায় হলদে ছিট পড়া রোগ বা মোজাইক এবং কৃমি জনিত রোগ হলো শিকড়ে গিট রোগ।

(১) চারা মড়কঃ

- বীজ বপনের পর প্রথম অবস্থায় যে রোগ দেখা দিতে পারে তা হচ্ছে চারা মড়ক।
- গাছের মোটামুটি ৩০ দিন বয়স পর্যন্ত চারা অবস্থা ধরা হয়। গাছ যখন ১ থেকে ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা হয় তখন এ রোগ দেখা দেয়।
- আক্রান্ত গাছের গোড়া কালো দাগ হয়ে গাছ মারা যায়।

চিত্র: মড়ক রোগাক্রান্ত চারা

দমনঃ

- চারা মড়কের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রধান উপায় হলো বীজ শোধন কারণ এটি বীজ বাহিত রোগ। বীজ বপনের আগে প্রোভেক্স-২০০, ০.৪% বা ৪ গ্রাম/কেজি হারে বীজ শোধন করে নিলে চারা মড়কের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
- বাটা রসুন ১২৫ গ্রাম/কেজি হারে বীজে ভালভাবে মিশিয়ে পরপর তিনদিন রোদ্রে শুকিয়ে ১ মাসের মধ্যে বীজ বপন করলে এ রোগ দমন হয়।
- ১ গ্রাম ডাইথেন/মেনার/ইন্ডোফিল-এম ৪৫, ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে চারা গাছে ছিটিয়ে দিতে হবে।

(২) কান্ড পচা রোগঃ

- এটি পাটের প্রধান রোগ।
- শুরুতে পাতায় ও গাছের কান্ডে বাদামী রং এর দাগ পড়ে আস্তে আস্তে গাঢ় রং এ পরিনত হয়।
- কালচে বাদামী বর্ণ স্থানে অসংখ্য বাদামী রং এর জীবানু দেখা যায়।
- মার্চ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত এ রোগের বিস্তৃতি দেখা যায়।
- দেশী ও তোষা উভয় জাতের পাটেই এ রোগের প্রকোপ দেখা যায়।

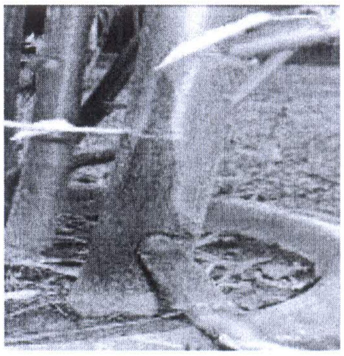

চিত্রঃ কান্ড পচা রোগ

দমনঃ

- চাষ করার সময় জমির সমস্ত আবর্জনা একসাথে করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে ফলে মাটির দূষণ কমে এবং মাটিবাহী ছত্রাক মারা যায় বা তার পরিমাণ কমে যায়
- বীজ বপনের আগে প্রোভেক্স-২০০, ০.৪% বা ৪ গ্রাম/কেজি হারে বীজ শোধন করে নিলে কান্ড পচা রোগ ছাড়াও চারা মড়কের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

- বাটা রসুন ১২৫ গ্রাম/কেজি হারে বীজে ভালভাবে মিশিয়ে পরপর তিনদিন রোদ্রে শুকিয়ে ১ মাসের মধ্যে বীজ বপন করতে হবে।
- ২ গ্রাম ডাইথেন/মেনার/ইন্ডোফিল- এম ৪৫, ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে চারা গাছে ছিটিয়ে দিতে হবে।

(৩) শুকনা ক্ষত রোগঃ

- শুধু দেশী পাটে এ রোগের প্রকোপ দেখা যায়।
- আক্রান্ত গাছের কান্ড ফেটে যায় এবং আঁশ খোসার মত বের হয়ে আসে।
- যার ফলে পাট আঁশের গুনাগুন খারাপ হয়ে যায় এবং দামও কমে যায়।

চিত্রঃ শুকনা ক্ষত রোগ

দমনঃ

- চাষ করার সময় জমির সমস্ত আবর্জনা একসাথে করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। ফলে মাটির দূষণ কমে এবং মাটিবাহী ছত্রাক মারা যায়।
- বীজ বপনের আগে প্রোভেক্স-২০০, ০.৪% বা ৪ গ্রাম/কেজি হারে বীজ শোধন করে নিলে চারা মড়কের হাত থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়।
- বাটা রসুন ১২৫ গ্রাম/কেজি হারে বীজে ভালভাবে মিশিয়ে পরপর তিনদিন রোদ্রে শুকিয়ে ১ মাসের মধ্যে বীজ বপন করতে হবে।
- ২ গ্রাম ডাইথেন/মেনার/ইন্ডোফিল- এম ৪৫ ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে চারা গাছে ছিটিয়ে দিতে হবে।

(৪) কালো পট্টি রোগঃ

- এ রোগের লক্ষন অনেকটা কান্ড পচাঁ রোগের মত তবে এতে কালো রং এর বেষ্টনীর দাগ পড়ে।
- আক্রান্ত স্থান ঘষলে হাতে কালো দাগ লাগে।
- কালচে বাদামী অংশে অসংখ্য বাদামী রং এর জীবাণু দেখা যায়।
- সাধারনত তোষা পাটে এ রোগের প্রকোপ বেশী দেখা যায়।
- আক্রান্ত গাছ সাধারনত কান্ড পচাঁ রোগের মত ভেঙ্গে পড়ে না তবে গোটা গাছটি শুকিয়ে মারা যায়।

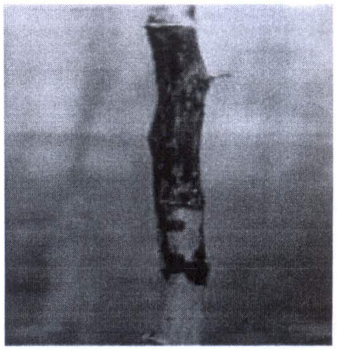

চিত্রঃ কাল পট্টি রোগ

দমনঃ

- চাষ করার সময় জমির সমস্ত আবর্জনা একসাথে করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। ফলে মাটির দূষন কমবে এবং মাটিবাহী ছত্রাক মারা যায়।
- বীজ বপনের আগে প্রোভেক্স-২০০, ০.৪% বা ৪ গ্রাম/কেজি হারে বীজ শোধন করে নিলে এ রোগ দমনের পাশাপাশি চারা মড়কের হাত থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়।
- বাটা রসুন ১২৫ গ্রাম/কেজি হারে বীজে ভালভাবে মিশিয়ে পরপর তিনদিন রোদ্রে শুকিয়ে ১ মাসের মধ্যে বীজ বপন করতে হবে।
- ২ গ্রাম ডাইথেন/মেনার/ইন্ডোফিল- এম ৪৫, ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে গাছে ছিটিয়ে দিতে হবে।

(৫) আগা শুকিয়ে যাওয়া রোগঃ

- দেশী ও তোষা উভয় জাতের পাটে এ রোগের প্রকোপ দেখা যায়।
- ঝড়ে বা অন্য কোন কারণে গাছে আঘাত লাগলে এ রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়।
- এ রোগের লক্ষন হলো গাছের আগা থেকে নীচের দিকে শুকাতে থাকে এবং গাছটি ধীরে ধীরে বাদামী হয়ে এক সময় মারা যায়।

চিত্রঃ আগা শুকিয়ে যাওয়া রোগ

দমনঃ

- তোষা ও কেনাফ এর জমিতে পর্যায়ক্রমে দেশী পাটের চাষ করলে রোগের প্রকোপ কমে।
- জমি হতে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকতে হবে।
- ২ গ্রাম ডাইথেন/মেনার/ইন্ডোফিল- এম ৪৫, ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে গাছে ছিটিয়ে দিতে হবে।

(৬) ঢলে পড়া রোগঃ

- সাধারনত তোষা পাটে এ রোগের প্রকোপ বেশী দেখা যায়।
- এ রোগে গাছ ঝিমিয়ে পড়ে এবং শিকড় পচেঁ যায়।
- ফুল আসার সময় এই রোগ বেশী দেখা যায়।

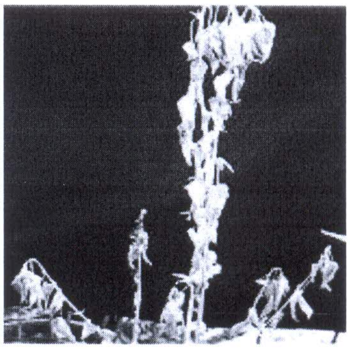

চিত্রঃ ঢলে পড়া রোগ

দমনঃ

- জমিতে এ রোগ দেখা দেয়া মাত্রই গাছ তুলে মাটিতে পুতে ফেলতে হবে।
- জমিতে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকতে হবে।
- ২ গ্রাম ডাইথেন/মেনার/ইন্ডোফিল- এম ৪৫, ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত গাছে ছিটিয়ে দিতে হবে।

(৭) নরম পচা রোগঃ

- দেশী ও তোষা উভয় জাতের পাটেই এ রোগের প্রকোপ দেখা যায়।
- এক নাগাড়ে কয়েকদিন বৃস্টি হলে এবং জমিতে পানি জমে থাকলে এ রোগের প্রাদুর্ভাব হয়।
- গাছের গোড়ায় কান্ডের উপর সাদা তুলার ন্যায় ছত্রাক দেখা যায় এবং পরে সরিষার দানার মত বাদামী রং এর জীবাণু দেখা যায়।
- এ রোগের ফলে গাছের গোড়া পচে যায় এবং গাছ ভেঙ্গে পড়ে।

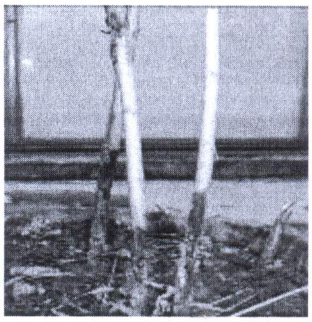

চিত্রঃ নরম পচা রোগ

দমনঃ

- চাষ করার সময় জমির সমস্ত আবর্জনা একসাথে করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। ফলে মাটি কম দূষিত হয় এবং মাটিবাহী ছত্রাক মারা যায়।
- জমিতে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকতে হবে।

- বর্দ্দো মিক্সার এর ১ পাউন্ড (৪৫০ গ্রাম) ১০ গ্যালন (৪৫০ লিটার) পানিতে মিশিয়ে জমি ভালভাবে ভিজিয়ে দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

(৮) পাতার হলদে সবুজ ছিট পড়া বা মোজাইকঃ

- এটি পাটের ভাইরাস জনিত রোগ। সাধারণত দেশি পাটে এর প্রকোপ বেশী লক্ষ করা যায়।
- পাতায় হলদে সবুজ ছিট দাগ পড়ে এবং আক্রান্ত গাছের বৃদ্ধি কমে যায়।
- আশেঁর পরিমান শতকরা ৫০% পর্যন্ত কমে যাওয়ার আশংকা থাকে।

চিত্রঃ মোজাইক রোগ

দমনঃ

- প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে নীরোগ গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
- জমিতে এ রোগ দেখা দেয়া মাত্রই আক্রান্ত গাছ তুলে মাটিতে পুতে ফেলতে হবে।
- ভাইরাসের বাহক সাদা মাছি দমনের জন্য পাট ক্ষেতে ১৫ মিলি ডায়াজিনন/হেয়জিনন, ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে গাছে ছিটিয়ে দিতে হবে।

(৯) শিকড় গিট রোগঃ

- দেশী ও তোষা উভয় জাতের পাটে এ রোগের প্রকোপ দেখা যায়। এটি ক্রিমি জনিত রোগ।
- এ রোগে আক্রান্ত গাছের শিকড়ে ছোট বড় অনেক গিট দেখা যায় ফলে শিকড় তার স্বাভাবিক কাজ যেমন পানি ও খাদ্যোপাদন সংগ্রহ করতে পারে না। তাই ধীরে ধীরে গাছ দুর্বল হয়ে এক সময় মরে যায়।
- বালিযুক্ত হালকা মাটি এবং স্যাঁতস্যাঁতে জমিতে এ রোগের প্রকোপ বেশী দেখা যায়।

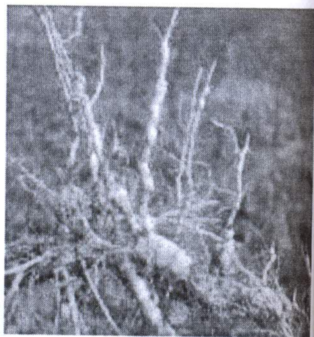

চিত্রঃ শিকড় গিট রোগ

দমনঃ

- ফুরাডান ৫ জি, ৪০ কেজি/হেক্টর হারে প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।
- জমি কিছুদিন পানি দ্বারা প্লাবিত করে রাখলে এ রোগের জীবানু বা কৃমি মারা যায়।

সারণি ৪: বালাইনাশক-এর তালিকা এবং প্রয়োগ মাত্রা

Sl. No.	Trade Name of Products	Recommended Diseases	Dosage rate/ha (ml/lt/gm/kg)
1	Dithane M-45	Stem rot, Seedling blight, Anthracnose, Black band, Die back, Wilting	2 gm/lit water
2	Manner M-45	Stem rot, Seedling blight, Anthracnose, Black band, Die back, Wilting	2 gm/lit water
3	Indofil M-45	Stem rot, Seedling blight, Anthracnose, Black band, Die back, Wilting	2 gm/lit water
4	Furadan 5G	Root knot disease	40 kg/ha
5	ACI FLO	Stem rot	3 ml /10 lit water
6	Naturezeb 80 WP	Stem rot	2 kg/ha
7	Symzeb 80 WP	Stem rot	2 kg/ha
8	Tipoff 28 SC	Stem rot	500 ml/ha

পাট, কেনাফ ও মেস্তার প্রধান প্রধান পোকা মাকড় ও দমন ব্যবস্থা

(১) উড়চুঙ্গাঃ

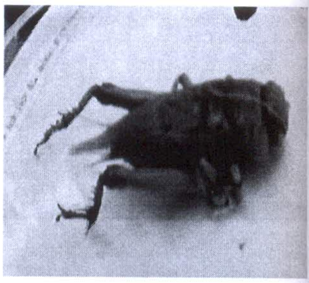

চিত্রঃ উড়চুঙ্গা

- এপ্রিল মাসের প্রথম থেকে মে মাসের শেষ পর্যন্ত উড়চুঙ্গার আক্রমন দেখা যায়।
- পূর্ণ বয়স্ক উড়চুঙ্গা কালো বাদামী রংয়ের এবং ৫ সে.মি. পর্যন্ত লম্বা হয়। এদের মুখ দেখতে ফড়িং এর মত। পেছনের পা জোড়া বেশ মোটা, পায়ে সারি সারি কাঁটা আছে।
- খরার সময় শুকনো ক্ষেতে এদের আক্রমন বেশী দেখা যায়।
- সাধারনত এরা বেলে ও বেলে দোঁয়াশ মাটিতে সুড়ঙ্গ তৈরী করে বাস করে।
- এরা দিনের বেলা গর্তের ভিতরে থাকে এবং সন্ধ্যায় গর্ত থেকে বের হয়ে গাছ কেটে গর্তের ভিতরে নিয়ে যায়। ফলে গাছের সংখ্যা কমে যায়।

দমনঃ

- যে সব জায়গায় উড়চুঙ্গার আক্রমন বেশী হয় সেখানে সাধারন পরিমানের চেয়ে ২০% বেশী হারে বীজ বপন করা ভাল। যাতে উড়চুঙ্গার ক্ষতি পুষিয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গাছ পাওয়া যায়।
- আক্রান্ত জমিতে গাছের উচ্চতা ২০ সে.মি. হওয়ার পর বাড়তি চারা বাছাই করা যেতে পারে।
- যে সব জমিতে প্রতি বছর উড়চুঙ্গা দ্বরা আক্রান্ত হয়, সে সব জমিতে সম্ভব হলে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে দুই সপ্তাহ দেরীতে বীজ বপন করলে আক্রমন কম হয়।
- আক্রমন বেশী হলে ডার্সবান ২০ ইসি, ডায়এলড্রিন ৪০ ডব্লিউপি, ২ মি.লি./লিটার পানিতে এবং অলড্রিন ৪০ ইসি, ১.৫ মি.লি./লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।

(২) বিছা পোকা বা শুয়ো পোকাঃ

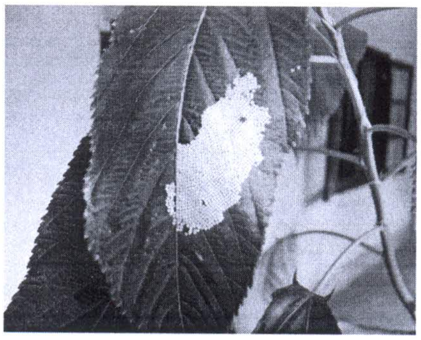

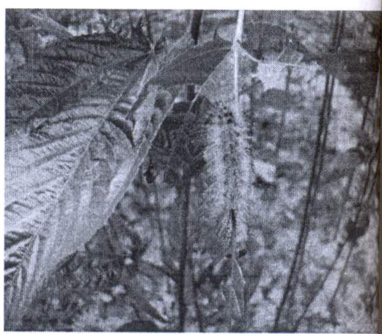

চিত্রঃ বিছা বা শুয়ো পোকা

- এদের গায়ে অসংখ্য শুয়ো গুচ্ছাকারে সাজানো থাকে।
- স্ত্রী মথ পাটের পাতার উল্টা দিকে গাদা করে ডিম পাড়ে।
- ডিম থেকে বাচ্চা বের হওয়ার পর প্রায় ৬-৭ দিন পর্যন্ত বাচ্চা গুলো পাতার উল্টো দিকে দলবদ্ধভাবে থাকে।
- দলবদ্ধভাবে থাকা অবস্থায় কীড়াগুলো পাতার উল্টো পিঠের সবুজ অংশ খেয়ে পাতাকে সাদা পাতলা পর্দার মত করে ফেলে।

- বড় হওয়ার সাথে সাথে এরা সারা মাঠ ছড়িয়ে পড়ে এবং পুরো পাতা খেতে শুরু করে।

দমনঃ

- পাটের পাতায় ডিমের গাদা দেখলে তা তুলে ধ্বংস করতে হবে।
- আক্রমনের প্রথম অবস্থায় কীড়াগুলো যখন পাতায় দলবদ্ধ অবস্থায় থাকে তখন পোকা সমেত পাতাটি তুলে পায়ে মাড়িয়ে বা গর্তে চাপা দিয়ে বা কেরোসিন মিশ্রিত পানিতে ডুবিয়ে মারতে হবে।
- বিছা পোকা যাতে এক ক্ষেত থেকে অন্য ক্ষেতে ছড়াতে না পারে, সেজন্য প্রতিবন্ধক নালা তৈরী করতে হবে।
- পাট কাটার পর জমি চাষ দিয়ে ফেলে রাখতে হবে যাতে পুত্তলীগুলো মারা যায় ও পাখী বা অন্যান্য প্রাণি সেগুলো খেয়ে পরবর্তীতে পোকার সংখ্য কমিয়ে দেয়।
- আক্রান্ত ক্ষেতে হেয়জিনন ৬০ ইসি, রিভা ২৫ ইসি এবং কারাতি ২ বা ৫ ইসি, ১মি.লি./লিটার, রিপকর্ড ১০ ইসি এবং সিমবুশ ১০ ইসি, ৫ মি.লি./লিটার হারে স্প্রে করতে হবে।

(৩) ঘোড়া পোকাঃ

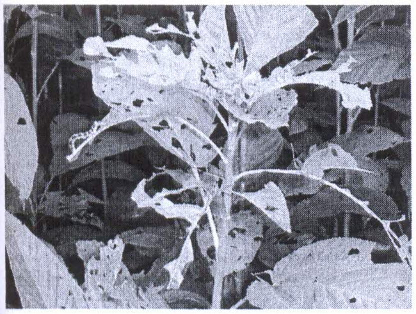
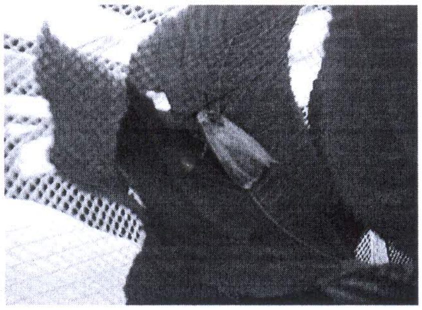
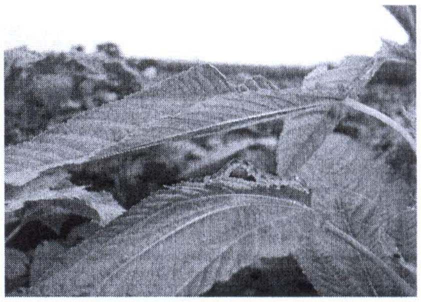

চিত্রঃ ঘোড়া পোকা

- স্ত্রী মথ পাতার নিচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ডিম পাড়ে।
- ঘোড়া পোকা পাট গাছের কচি ডগা ও পাতা আক্রমন করে।
- বার বার কচি ডগা আক্রমনের জন্য গাছের আগা নষ্ট হয়ে যায় এবং শাখা প্রশাখা বের হয়। এতে পাটের ফলন ও আশেঁর মান কমে যায়।

দমনঃ

- পাট ক্ষেতে পোকার আক্রমন দেখা দিলে কেরোসিন ভেজানো দড়ি গাছের উপর দিয়ে টেনে নিলে পোকার আক্রমন কমে যায়।
- শালিক বা ময়না জাতীয় পাখি ঘোড়া পোকা খেতে পছন্দ করে। পাট ক্ষেতে গাছের ডাল পুতে পাখি বসার ব্যবস্থা করলে এরা পোকা খেয়ে পোকার সংখ্যা কমিয়ে ফেলে।
- আক্রমন বেশী হলে হেয়জিনন ৬০ ইসি, রিভা ২৫ ইসি এবং কারাতি ২ বা ৫ ইসি, ১মি.লি./লিটার, রিপকর্ড ১০ ইসি এবং সিমবুশ ১০ ইসি, ৫ মি.লি./লিটার হারে স্প্রে করতে হবে।

(৪) চেলে পোকাঃ

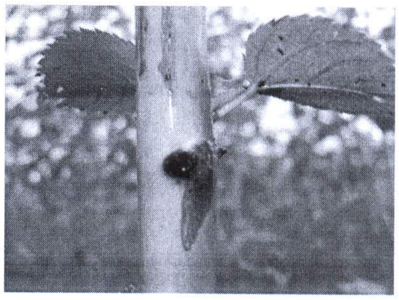

চিত্রঃ চেলে পোকা আক্রান্ত গাছ

- পূর্ণ বয়স্ক চেলে পোকা এক ধরনের ছোট কালো রং এর শুড় বিশিষ্ট পোকা।
- স্ত্রী পোকা তার শুড় দ্বারা গাছের ডগা, পর্ব বা গিটে ছিদ্র করে ডিম পাড়ে।
- পাট গাছের চারা অবস্থায় চেলে পোকা আলপিনের ছিদ্রের মতে করে পাতা খায়। তারপর ডিম পাড়ার জন্য স্ত্রী পোকা চারাগাছের কচি ডগায় আক্রমন করে।
- ডিম থেকে বাচ্চা বের হয়ে ডগার ভিতরে চলে যায় এবং সেখানেই বড় হতে থাকে। ফলে গাছের ডগা মারা যায় এবং শাখা প্রশাখা বের হয়।
- আক্রান্ত স্থান থেকে এক প্রকার আঠা জাতিয় পদার্থ বের হয়ে আসে এবং কীড়ার মলের সাথে শক্ত গিটের সৃষ্টি করে। পাট পচানোর সময় সেই গিট পচে না।
- ফলে আঁশের মান ক্ষুন্ন হয় ও দাম কম পাওয়া যায়।

দমনঃ

- পাট ক্ষেতের পাশে বনওকড়া গাছ এবং অন্যান্য আগাছা পরিস্কার রাখলে এ পোকার আক্রমন কম হয়।
- পাট মৌসুমের প্রথমে ডগা আক্রান্ত চারাগুলো তুলে ফেললে পরবর্তীতে এদের আক্রমন কমে যায়।
- আক্রমন বেশী হলে সুপারথিন ১০ইসি, ০.৫ মি.লি./লিটার, রিপকর্ড ১০ ইসি এবং সিমবুশ ১০ ইসি ০.৫ মি.লি./লিটার হারে স্প্রে করতে হবে।

(৫) হলুদ মাকড়ঃ

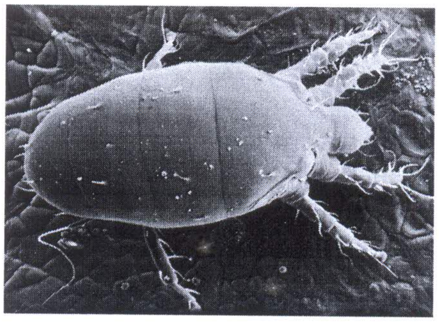 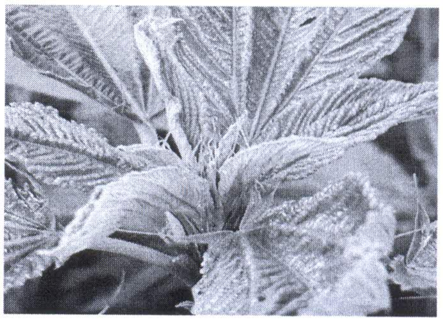

চিত্রঃ হলুদ মাকড় ও আক্রান্ত গাছ

- পাটের পোকামাকড়ের মধ্যে হলুদ মাকড় এখন সবচেয়ে বেশী ক্ষতিকারক।
- পাটের আঁশ ও বীজ উভয় ফসলেরই এরা ব্যাপক ক্ষতি করে।
- পূর্ণাঙ্গ মাকড় খুবই ক্ষুদ্র এবং খালি চোখে দেখা যায় না। কিন্তু আক্রান্ত কচি পাতার উল্টো দিকে ভালমত পরীক্ষা করলে এদেরকে সাদা গুড়োর মত দেখা যায়।

- এ মাকড় পাটের কচি পাতা আক্রমন করে পাতার রস চুষে খায়। এতে কচি পাতা কুচঁকে যায় এবং তামাটে রং ধারন করে।
- আক্রমনের প্রকোপ বাড়লে পাতা ঝড়ে পড়ে ও গাছের ডগা নষ্ট হয়ে যায়, ফলে গাছের বৃদ্ধি কমে যায় ও পরে শাখা প্রশাখা বের হয়।

দমনঃ

- আক্রমন বেশী হলে সালফার জাতীয় যে কোন ঔষধ যেমন- সালফার ৮০ ডব্লিউপি, সালফেক্স ৮০ ডব্লিউপি, কুমুলাস ৮০ ডিএফ, রনোভিট ৮০ ডব্লিউপি, প্রসালফ ৮০ ডিএফ, নিওরোন ৫০০ ইসি, ২.৫ গ্রাম/লিটার (২.৫০ কেজি/হে.) হারে স্প্রে করতে হবে।
- নিম পাতা বেঁটে পানিতে মিশিয়ে (১:২০) এর নির্যাস/রস তৈরী করে আক্রান্ত পাট গাছের কচি পাতায় ছিটালে ভাল ফল পাওয়া যায়। হলুদ মাকড় দমন করতে হলে পরপর দুই দিন ঔষধ ছিটালে ভাল ফল পাওয়া যায়। ঔষধ ছিটানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে পাতার উল্টো পৃষ্ঠ যেন ভালোভাবে ভিজে।

(৬) ছাতরা পোকাঃ

- পোকাগুলো একসাথে থাকে ও এদের উপরিভাগ সাদা তুলার মতো গুড়ায় আবৃত থাকে।
- ছাতরা পোকা গাছের ডগায় দল বেঁধে বাস করে এবং কচি ডগা ও পাতার রস চুষে খায়।
- কচি ডগা ও পাতাগুলো কুকঁড়ে যায়, আক্রান্ত স্থান ফুলে উঠে।
- পাতা গুলো ঝড়ে যায় এবং আক্রান্ত স্থান হতে শাখা প্রশাখা বের হয়।

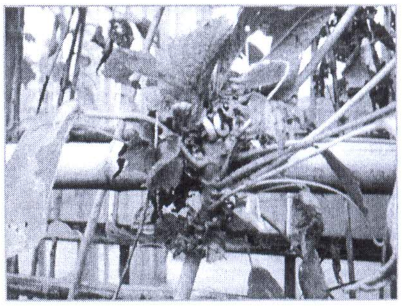

চিত্রঃ ছাতরা পোকা আক্রান্ত গাছ

দমনঃ

- মাঠে ২/১ টি গাছে আক্রমন দেখা দেয়ার সাথে সাথে আক্রান্ত গাছগুলোর ডগা কেটে ফেলে পায়ে মাড়িয়ে বা পুড়িয়ে পোকা ধ্বংস করতে হবে।
- আক্রমন বেশী হলে হেয়জিনন ৬০ ইসি, রিপকর্ড ১০ ইসি এবং সিমবুশ ১০ ইসি, ৫ মি.লি./লিটার হারে স্প্রে করতে হবে।

(৭) কেনাফ স্পাইরাল বোরারঃ

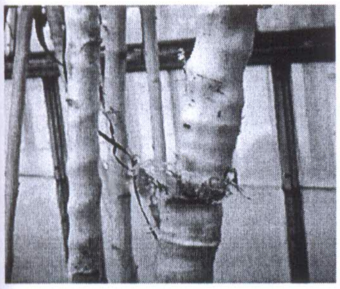

চিত্রঃ স্পাইরাল বোরার আক্রান্ত গাছ

চিত্রঃ স্পাইরাল বোরার

- এদের রং উজ্জ্বল নীল। সাধারনত ৪-৬ মি.মি. লম্বা। এদের মাথা ছোট, শরীর লম্বা।
- ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে ছালের নীচের নরম অংশ খেতে শুরু করে।
- কীড়া কান্ডের নীচের দিক হতে ছালের ভিতরে আক্রমন করে স্ক্রুর মতো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠতে থাকে।
- আক্রান্ত স্থানগুলো ফুলে উঠে ও পরে এ সমস্ত স্থানে গিরার সৃষ্টি হয়।

- কখনও কখনও ঝড়ে আক্রান্ত স্থান ভেঙ্গে যায়। ফলে আঁশের মান ক্ষুন্ন হয় এবং ফলনও কম হয়।

দমনঃ

- যে সমস্ত ক্ষেত আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে প্লাবিত হয় এমন ক্ষেতে কেনাফ চাষ করলে এ রোগের আক্রমন কমানে সম্ভব, এমনকি এড়ানো যায়।
- আক্রমন বেশী হলে হেয়জিনন ৬০ ইসি, রিপকর্ড ১০ ইসি এবং সিমবুশ ১০ ইসি, ৫ মি.লি./লিটার হারে স্প্রে করতে হবে।

সারণি ৫: বালাইনাশক-এর তালিকা ও প্রয়োগমাত্রা

Sl. No.	Trade name	Recommended Pests	Dosage rate/ha
1	Vertex 1.8 EC	Yellow mite	1.20 L
2	Kiteen 1.8 EC	Yellow mite	1.20 L
3	Bletin 1.8 EC	Yellow mite	1.00 L
4	Beltin 1.8 EC	Yellow mite	1.00 L
5	Sevin 85 SP	Jute Hairy Caterpillar, Weevil,Semilooper	1.70 kg
6	Ripcord 10 EC	Jute Hairy, Caterpillar, Semilooper, Field Cticket	550 ml
7	Hayzinon 60 EC	Jute Hairy Caterpillar	1.68 L
8	Emacto 5WDG	Jute Hairy Caterpillar	1.50 kg
9	Karate 2.5 EC	Jute Hairy Caterpillar	1ml/L of water
10	Queenphos 25 EC	Jute Hairy Caterpillar	1.00 L
11	Nitro 505 EC	Jute Hairy Caterpillar/ Cutworm/Mealy bug	500 ml

পাট ও পাট জাতীয় ফসলের জমির জন্য উপযুক্ত নিষ্কাশন ব্যবস্থা

পাট ও পাট জাতীয় ফসলের (বিশেষ করে তোষা) জমিতে পানি জমে থাকলে ফলনের উপর তার ব্যাপক প্রভাব পড়ে অর্থা' ফলন কমে যায়, উপযুক্ত নিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকলে ক্ষতির হাত হতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। এই ব্যবস্থার সুবিধা পেতে হলে সারিতে পাট বোনা অপরিহার্য। সারিতে পাট বপন করে জমির যে দিকটায় উপযুক্ত নিষ্কাশন (স্থায়ী) নালা আছে সে দিকেই জমিতে জমে থাকা অতিরিক্ত পানি সরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হয়। দুই সারি পাট গাছের মাঝ বরাবর জমির যে দিকে নিষ্কাশন নালা আছে তার উল্টা দিক হতে হ্যান্ডহো বা ছোট-চিকন কোদাল দিয়ে সরু অগভীর নালা (ফারো) করে দিতে হয়। নালাটির গভীরতা নিষ্কাশন নালার দিকে ক্রমেই গভীর হওয়া জরুরী। নিম্নোক্ত চিত্রটির মাধ্যমে পাটের জমির উপযুক্ত নিষ্কাশন ব্যবস্থা দেখানো হলো।

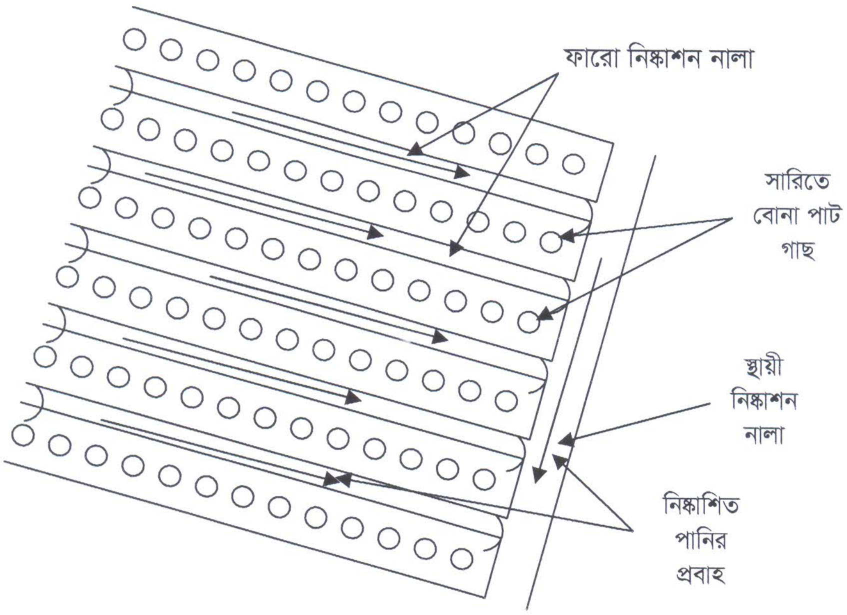

চিত্রঃ পাটের জমির জন্য উপযুক্ত ফারো নিষ্কাশন ব্যবস্থা।

চিত্র: ফারো নিষ্কাশন নালাসহ ও নিষ্কাশন নালাছাড়া জমিতে পাট গাছের অবস্থা।

ফসল কর্তন পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

ফসল কাটা থেকে আঁশ শুকানো পর্যন্ত ধাপগুলোই কর্তনোত্তর ব্যবস্থাপনার আওতায় পড়ে এবং এ ধাপগুলোর উপরই আঁশের মান নির্ভর করে। গাছ থেকে আঁশ সংগ্রহ করার জন্য কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। যেমন- গাছ কাটা, পচন, আঁশ ছাড়ান, আঁশ ধোয়া, আঁশ শুকানো ইত্যাদি। উন্নত গুণাগুণ সম্পন্ন জাতের বীজ বপন করে যথোপযুক্ত পরিচর্যায় ফসল আবাদ করা হলেও শেষোক্ত প্রক্রিয়া অর্থাৎ কর্তনোত্তর ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপের প্রতি নজর দেয়া না হলে, আঁশ নিম্নমানের হয়ে থাকে। সে প্রেক্ষিতে বীজ বপন থেকে শুরু করে আশ গুদাম জাতকরণ পর্যন্ত যে কাজগুলো করতে হয় তার মধ্যে এ ধাপটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রধান ধাপসমূহ নিম্নরুপঃ

(ক) ফসল কর্তন সময়ঃ

সাধারণত আশঁ জাতীয় গাছে যখন ফুল আসা শুরু হয় বা ফল ধারণ শুরু হয় তখন ফসল কাটা হয়। কৃষকগণ অনেক সময় ফলন বেশী পাবার জন্য দেরীতে ফসল কাটে। পরীক্ষণের মাধ্যমে দেখা গিয়েছে যে, বপনের ৬০-১০৫ দিনের মধ্যে কর্তনসুচক কম বেশী স্থির থাকে এবং ১২০ দিনের দিকে তা হঠাৎ অধিক বৃদ্ধি পায়। এ থেকে ধারণা করা যায় যে অধিকাংশ জাতেরই ১২০ দিনের পরও আঁশের ফলন বাড়ানোর প্রেক্ষিতে প্রয়োগকৃত পুষ্টি দ্রব্য ব্যবহারের সুযোগ আছে। কিন্তু গাছের বয়সের ৬০-৯০ দিনের মধ্যে সার প্রয়োগ করা হলে তা বৃদ্ধি এবং কর্তন সুচককে বাড়িয়ে ১২০ দিনে প্রমিত ফলন পেতে সহায়তা করে। কৃষিতাত্ত্বিক গবেষণায় আরও লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, আঁশের অধিক ফলনের জন্য ফসলের প্রাথমিক পরিচর্যা খুবই গুরুত্বপুর্ণ। বর্তমানে জমির উপর প্রচন্ড চাপ রয়েছে। তাই ফসলকে অধিক দিন জমিতে রেখে ফলন বাড়ানোর চেয়ে প্রাথমিক পরিচর্যাগুলো ঠিকমত করার পাশাপাশি নির্ধারিত হারে সার প্রয়োগ করে নির্ধারিত সময়ে অধিক ফলন পাওয়ার জন্য চেষ্টা করা প্রয়োজন। সার্বিকভাবে প্রয়োজন অনুযায়ী (পরবর্তি ফসলের জন্য) গাছের বয়স ১০০ থেকে ১২০ দিন হলে তা কর্তন করা উচিত।

জুট হার্ভেস্টার

পাওয়ার টিলার চালিত একটি যন্ত্র যা দিয়ে পাট, কেনাফ ও মেস্তা ফসল কাটা যায়। সনাতন পদ্ধতিতে কাঁচি/হাসুয়া দিয়ে ফসল কাটার তুলনায় জুট হার্ভেষ্টার দ্বারা স্বল্প সময় ও কম শ্রমিক খরচে কাটা যায়। এক জন লোক সহজেই যন্ত্রটি চালাতে পারে। অন্য সময় পাওয়ার টিলার জমি চাষের কাজে বা অন্য কাজে ব্যবহার করা যায়।

(খ) পচন প্রক্রিয়াঃ

পানি এবং পানিতে বসবাসকারী অসংখ্য জীবাণুর মিলিত কার্যক্রমের ফলে পাট ও আশঁ জাতীয় গাছের ছাল থেকে আঁশ পৃথক হওয়ার প্রক্রিয়াকে পচন প্রক্রিয়া বলা হয়। বাংলাদেশের ব্যাপক এলাকায় আশঁ জাতীয় ফসল চাষ করা হয়। এর মধ্যে কোথাও কোথাও ফসল কাটার সময় পর্যাপ্ত পানি পাওয়া যায়, আবার কোথাও কোথাও পচানোর সময় পানি থাকে না বা থাকলেও খুবই অপর্যাপ্ত এবং অপরিস্কার থাকে। এ প্রেক্ষিতে স্থানোপযোগী পচন পদ্ধতি অনুসরণ করলে এদেশের উৎপাদিত সকল আঁশই উন্নত মানের হতে পারে। সে অবস্থা বিচার করে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট পচন সম্পর্কীয় যে সকল প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে তাকে মোটামুটি দুভাগে বিভক্ত করা যায় যেমনঃ (১) পর্যাপ্ত পানি থাকা অঞ্চলের জন্য প্রযুক্তি এবং (২) অপর্যাপ্ত পানি বিশিষ্ট অঞ্চলের জন্য প্রযুক্তি।

(১) পর্যাপ্ত পানি অঞ্চলঃ

জমিতে ছোট বড়, চিকন, মোটা, নানা রকমের গাছ হয়। ছোট ও চিকন গাছ পৃথক করে আলাদা আলাদা আঁটি বাঁধতে হবে। এধরনের একটি আটির ওজন ১০ সের বা ১০ কেজি হবে। চিকন এবং মোটা গাছগুলোকে পৃথক পৃথকভাবে জাক দিতে হবে। গাছের আঁটি কখনও খুব শক্ত করে বাঁধা যাবে না যাতে পচতে বেশি সময় না লাগে। কারণ শক্ত আঁটির মধ্যে পচনকারী ব্যাকটেরিয়া বা জীবানু ভাল ভাবে প্রবেশ করতে পারেনা।

পাতা ঝরানোঃ

আঁটি বাঁধা শেষ হলে সেগুলোকে ৩-৪ দিন জমির উপর স্তুপ করে রেখে পাতা ঝড়িয়ে নিতে হবে। পাতাগুলোকে জমির উপর ছড়িয়ে দিতে হবে, এগুলো ভালো সার হিসেবে কাজ করবে। তবে ফসল কাটার সময় জমিতে প্রচুর পানি থাকলে পাতা না ঝরিয়ে আঁটিগুলো সরাসরি জমিতেই জাগ দেওয়া যেতে পারে।

পাট জাতীয় আঁশ ফসলের পচন পানি নির্বাচনঃ

যে পানি খুব পরিস্কার এবং অল্প স্রোত থাকে সেই পানি পচনের জন্য সবচেয়ে ভাল। এ ধরনের পানি সাধারণতঃ বিল এবং কিছু কিছু খালের মধ্যে দেখা যায়। কোন নিকটবর্তী স্থানে এ ধরণের পানি থাকলে সে পানিতে ফসল পচনের ব্যবস্থা করা উত্তম।

জাগ তৈরী ও ইউরিয়া সার ব্যবহারঃ

জাগ তৈরীর সময় আঁটিগুলোকে প্রথম সারিতে লম্বালম্বি, দ্বিতীয় সারিতে আড়াআড়ি এবং তৃতীয় সারিতে আবার লম্বালম্বি এ ভাবে সাজিয়ে জাগ তৈরী করতে হবে। এভাবে জাগ তৈরী করলে পানি এবং পচন জীবানু জাগের মধ্যে সহজে চলাফেরা করতে পারে। বদ্ধ পানিতে অর্থাৎ ছোট পুকুরে বা ডোবায় ফসল পচালে ইউরিয়া সার ব্যবহার করলে পচন জীবাণুর কার্যকারিতা বৃদ্ধি পেয়ে দ্রুত গাছ পচিয়ে ফেলে এবং আঁশের রং ও মান ভাল হয়। প্রতি ১০০০ আঁটি কাঁচা গাছের জন্য প্রায় ১ কেজি বা ১ সের ইউরিয়া ব্যবহার করা যেতে পারে। ইউরিয়া সার পাত্রে গুলে পচনের পানিতে মিশিয়ে বা সরাসরি জাকের আঁটির সারিতে ছিটিয়ে দেয়া যেতে পারে।

পচন সমাপ্তি নির্ণয়ঃ

গাছ পচনের শেষ সময় ঠিক করা অর্থাৎ পচন সমাপ্তি নির্ণয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খুব কম পচলে আঁশের গায়ে ছাল লেগে থাকে। কাজই এমন সময় পচন থামাতে হবে যখন আঁশগুলো একটার সাথে আর একটা না লেগে থাকে, কিন্তু শক্ত থাকে। জাক দেবার ১৫-১৬ দিন পর থেকে জাক পরীক্ষা করা উচিত। ২/৩ টি পচা জাক থেকে বের করে ধুঁয়ে আঁশ পরীক্ষা করলে পচনের শেষ সময় ঠিক করা যায়। পচা গাছের মধ্যাংশ থেকে ১ ইঞ্চি বা আড়াই সেন্টিমিটার পরিমাণ ছাল কেটে ছোট শিশির ভিতর পানি দিয়ে ঝাঁকানোর পর শিশির পানি ফেলে আবার পরিস্কার পানি দিয়ে ঝাঁকিয়ে যদি দেখা যায় যে আঁশগুলো পরস্পর পৃথক হয়ে গেছে তখন বুঝতে হবে যে পচন শেষ হয়েছে। মনে রাখতে হবে বেশী পচনের চেয়ে একটু কম পচন ভাল। কারণ বেশী পচলে আঁশের শক্তি কমে যায়।

আঁশ ছাড়ানো প্রক্রিয়াঃ

পচন শেষ হলে গাছ থেকে দুইভাবে আঁশ ছাড়ানো যেতে পারেঃ (ক) শুকনো জায়গায় বসে আঁশ ছাড়ানো যেতে পারে অথবা (খ) পানির মধ্যে দাড়িয়ে বাঁশের আড়ায় পচানো গাছ রেখে তা থেকে এক সঙ্গে বেশ কয়েকটি গাছ নিয়ে গোড়ার অংশ কাঠের টুকরো দিয়ে থেতলিয়ে তা থেকে আঁশ ছাড়ানো যেতে পারে। যে পদ্ধতিতেই আঁশ ছাড়ানো হোক না কেন আঁশ ছাড়াবার সময় গাছের গোড়ার অংশের পচা ছাল হাত দিয়ে চিপে টেনে মুছে ফেলে দিলে আঁশে কাটিংস এর পরিমাণ অর্থাৎ গোড়ার শক্ত অংশের পরিমাণ অনেক কম হয়। এ ছাড়া আঁশ ছাড়াবার সময় গাছের গোড়ার অংশ এক টুকরো শক্ত কাঠ বা বাঁশ দিয়ে থেতলে নিলে আঁশের কাটিংসের পরিমাণ অনেক কম হয়। দেখা গেছে গাছ থেকে একটা একটা করে আঁশ ছাড়ালে আঁশের গুণাগুণ ভাল থাকে।

আঁশ ধোয়াঃ

আঁশ ছাড়ানোর পর তা পরিস্কার পানিতে ভালভাবে ধুয়ে নিতে হয়। ধোয়ার সময় আঁশের গোড়া সমান করে নিতে হবে। এমন ভাবে আঁশ ধুতে হবে যেন কোন রকম পচা ছাল, ভাঙ্গা পাট খড়ি, অন্য কোন ময়লা, কাঁদা ইত্যাদি আঁশের গায়ে লেগে না থাকে। কারণ এতে আঁশের মান কমে যায়।

(২) অপর্যাপ্ত পানি অঞ্চলে আঁশ সংগ্রহ পদ্ধতিঃ

যে সকল অঞ্চলে ফসল কাটার সময় পচানোর জন্য প্রয়োজনীয় পানি থাকে না, সেসব অঞ্চলকে অপর্যাপ্ত পানি অঞ্চল বলে ধরা হয়। এ সকল অঞ্চলের জন্য বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট রিবনিং ও রিবন রেটিং প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে।

রিবন রেটিং পদ্ধতিঃ

এ পদ্ধতিতে বাঁশের হুক বা রিবনারের সাহায্যে কাঁচা গাছ থেকে ছাল পৃথক করা হয়।

ছাল ছাড়াবার উপায়ঃ

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট বাঁশের হুকের সাহায্যে গাছের ছাল ছাড়াবার জন্য একটি নতুন কৌশল বের করেছে। এ কৌশলের মাধ্যমে অতি সহজেই কাঁচা গাছ থেকে ছাল ছাড়ানো যায়। নতুন উপায়ে গাছ থেকে ছাল ছাড়াবার উপায়গুলো নিচে দেয়া হলো-

- প্রথমে ৬ ফুট বা প্রায় ১৮০ সে.মি. লম্বা একখন্ড বোরাক বাঁশ নিয়ে তার কোন এক প্রান্ত আড়াআড়িভাবে কাটতে হবে যেন বাঁশের প্রান্তটির দুইদিক ইউ এর মত দেখায়।
- এবার বাঁশের খুঁটির গোড়ার কিছু অংশ মাটির মধ্যে শক্ত করে পুতে দিতে হবে। পাশাপাশি ৩-৪ ফুট (৯০-১২০ সে.মি.) অন্তর অন্তত প্রয়োজন মত এমন বেশ কয়েকটি বাঁশের হুক তৈরী করা যেতে পারে।
- এবার ঐ বাঁশের হুকগুলির সঙ্গে একটি মুরুলী বাঁশ দিয়ে আড়া বেঁধে তার উপর পাট ও সমগোত্রীয় আঁশ ফসলের গাছ জমি থেকে কেটে এনে দাঁড় করিয়ে রাখা যাবে।
- গাছগুলো বাঁশের আড়ার উপর দাঁড় করানোর পুর্বে গাছের গোড়ার ৩-৪ ইঞ্চি (৮-১০ সে.মি.) অংশ একটি শক্ত কাঠের হাতুড়ির সাহায্যে থেতলে নিতে হবে।
- এবার প্রতিটি গাছের গোড়ার থেতলানো ছালগুলো হাত দিয়ে দুই ভাগ করে গাছের গোড়া হুকের মধ্যে রাখতে হবে।

- গোড়ার ছালের দুই ভাগ দু'হাতে ধরে জোরে টান দিলে দেখা যাবে গাছের ছালগুলো সহজেই খড়ি থেকে আলাদা হয়ে পাট খড়ি সামনের দিকে চলে গেছে। এভাবে ৩-৪ টি গাছের ছাল এক সঙ্গে বের করা যায়। পরে ছালগুলোকে গোলাকার মোড়া বেঁধে অল্প পানিতে পচানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

পাওয়ার রিবনারের সাহায্যে ছাল ছাড়ানোর পদ্ধতিঃ

- প্রথমে কাঁটা গাছ থেকে পাতা ছাড়িয়ে বা ঝড়িয়ে নিয়ে মেশিনের ভিতর দিয়ে চালনা করলেই গাছ থেকে ছাল আলাদা হয়ে যায়, কিন্তু কাঠি ভেঙে যায়। এ পদ্ধতি জনপ্রিয় হওয়ার ক্ষেত্রে এটি একটি প্রতিবন্ধকতা।
- কাঠি আস্ত রেখে ছাল ছাড়ানোর গবেষণা চলছে।

ছাল পচানো, আঁশ ধোয়া এবং শুকানোর পদ্ধতিঃ

- বড় মাটির চাড়িতে কাঁচা ছালগুলোকে গোলাকার মোড়া বেঁধে সাজিয়ে রেখে পরিস্কার পানি দিয়ে চাড়িটি ভরে দিতে হবে। একটি বড় চাড়িতে প্রায় ৩০ কেজি কাঁচা ছাল পচানো যায়।
- যদি আশেপাশে ছোট ডোবা বা পুকুর বা খাল বা কম গভীরতা সম্পন্ন জলাশয় থাকে তবে ছালগুলোকে গোলাকৃতি মোড়া বেঁধে একটা লম্বা বাঁশের সঙ্গে ঝুলিয়ে পানির মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে পচানো যেতে পারে।
- বাড়ীর আশে পাশে অথবা ক্ষেতের পাশে ১৫-১৬ ফুট লম্বা, ৬-৮ ফুট প্রস্থ এবং ২ ফুট গভীর (পলিথিনের মাপ অনুসারে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা কম বেশী করা যেতে পারে) গর্ত খুঁড়ে গর্তের তলা ও কিনারা পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিয়ে সংলগ্ন স্থান থেকে পরিস্কার পানি দিয়ে গর্তটি ভরে সেখানে ছালগুলো পচানো যায়। সম্ভব হলে কচুরী পানা দিয়ে ছালের মোড়াগুলো ঢেকে দেয়া যেতে পারে। গর্তে কিছু পাট বা সমগোত্রীয় আঁশ ফসলের পচন পানি বা ইউরিয়া সার মিশিয়ে দিলে পচন গতি ত্বরান্বিত হয়।
- দেখা গিয়েছে যে ৮-১০ দিনের মধ্যেই ছালগুলো পচে যায়।
- পচা আঁশগুলোকে পরিস্কার পানিতে ধুয়ে বাঁশের আড়া/ব্রিজের রেলিং/ঘরের চাল ইত্যাদি স্থানে ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। আঁশ কখনও মাটিতে শুকানো উচিৎ নয়। কারণ এতে আঁশে ধূলোবালি লেগে এর মান কমিয়ে দেয়।

ছাল পচানোর সুবিধাঃ

- ছাল পচতে অনেক কম সময় লাগে।
- আঁশে কোন প্রকার কাটিংস থাকে না।
- ভাল মানের আঁশে বেশী মূল্য পাওয়া যায়।
- পচন ব্যবস্থাটি অধিকতর স্বাস্থ্যসম্মত।

আঁশের রং উজ্জ্বলকরণঃ

অপরিস্কার বা অনুপযুক্ত পানিতে আঁশ ধোয়ার পর যদি দেখা যায় আঁশের রং কালো বা শ্যামলা হয়ে গেছে তাহলে নিম্নরুপে আঁশের রং উজ্জ্বল করা যায়ঃ

- পরিস্কার পানিতে রাসায়নিক রি-এজেন্ট হিসাবে প্রতি লিটার পানিতে ৬ গ্রাম টিএসপি সার মিশাতে হবে।
- টিএসপি সার ৩০মিনিট থেকে ১ ঘন্টা পূর্বে পানিতে মিশিয়ে স্বচ্ছ দ্রবণ তৈরি করতে হবে।

- মাটি/সিমেন্টের চাড়িতে বা মাটিতে গর্ত করে মোটা পলিথিন বিছিয়ে দিয়েও এপ্রযুক্তি ব্যবহার করা যাবে।
- পানিতে দ্রবণ তৈরি করার পর পরিস্কার পানিতে ধোয়া ভিজা কালচে আঁশগুলোকে ঐ দ্রবণে ৪-৫ মিনিট ভিজিয়ে রাখলেই আঁশের কালচে রং দূরীভুত হয়ে আঁশগুলো সোনালী রং এ পরিনত হবে।
- নিদিষ্ট সময় ভিজিয়ে রাখার পর পুনরায় না ধুঁয়ে আঁশকে সরাসরি বাঁশের আড়ায়, ব্রীজের রেলিং, টিনের চালায় ইত্যাদিতে শুকাতে দিতে হবে। শুকানোর পর গুদামজাতের ব্যবস্থা করতে হবে।
- এক মণ পানিতে প্রায় ১ কেজি তেঁতুল গুলে সেই তেঁতুল গোলা পানির মধ্যে আঁশগুলা ৪-৫ মিনিট ডুবিয়ে রাখলেই আঁশের রং উজ্জল হয়ে যাবে। তবে মনে রাখতে হবে, তেঁতুলে এক প্রকার এসিড রয়েছে, তাই আঁশগুলোকে সাথে সাথে খুব ভাল করে পরিস্কার পানিতে ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হবে, যাতে তেঁতুলের রস আঁশের সঙ্গে লেগে না থাকে। ১ কেজি তেঁতুল দিয়ে ৪০ কেজি ১ কেজি তেঁতুল রং উজ্জ্বল করা যায়।

আঁশের শ্রেণী বিন্যাসঃ

আঁশ সংগ্রহের পর আসে তার বাজারজাতকরণ এবং সেটা হয়ে থাকে ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের মধ্যে আঁশের মানানুসারে সমঝোতামূলক মূল্য নির্ধারণ করে। বিভিন্ন প্রকার আঁশকে গুনগত দিক থেকে মূল্যায়ন করাকেই আমরা বলি আঁশের শ্রেণী বিন্যাস। কাজেই আঁশের সঠিক শ্রেণী বিন্যাস অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক বাজারে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আঁশের বর্তমান শ্রেণী বিন্যাস পদ্ধতিঃ

বর্তমান আঁশের শ্রেণী বিন্যাসকালে হাত দিয়ে নেড়ে এবং চোখে দেখে আঁশের গুণাগুণ বিচার করা হয়। এ পদ্ধতিতে আঁশ যাচাই এর সময় দেখা যায় যে এত বিভিন্ন শ্রেণীর আঁশ উৎপন্ন হয় যে এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীর আঁশকে অতি সহজে পৃথক করা সম্ভব হয় না। বাংলাদেশ স্টান্ডার্ড ইনিষ্টিটিউশন বহু প্রচেষ্টার পর এ শ্রেণী বিন্যাস পদ্ধতিকে কিছুটা সহজতর করতে এবং সংখ্যা কমাতে সক্ষম হয়েছে।

শ্রেণী বিন্যাসের জন্য বিবেচ্য বিষয়ঃ

আঁশের গুণাগুণ যাচাই করে শ্রেণী বিন্যাস কালে যে সমস্ত উপাদন বা বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হয় তা সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা করা হল-

আঁশের শক্তিঃ আঁশ কত শক্ত অর্থাৎ আঁশ কতটুকু টান বা জোর সহ্য করত পারে।

আঁশের মসৃনতাঃ আঁশ কতটুকু মসৃন বা অমসৃন। আঁশ কতটা হালকা বা ভারী। কত চক চকে আঁশে আঠলে অংশের পরিমাণ ইত্যাদি।

আঁশের পরিচ্ছন্নতাঃ ধূলা, বালি, কাঠির অংশ বিশেষ, আঁশে শক্ত বা অ-পচা অংশ বিশেষের পরিমান।

আঁশের রং: তোষা এবং দেশী পাটের বিশেষ নির্দিষ্ট আদর্শ রং আছে। এ রংগুলো হলো তোষার জন্য উজ্জ্ব সোনালী এবং দেশী পাটের জন্য মাখন-সাদা। তবে এ রং এর তারতম্য নির্ভর করে কি প্রকার এবং কি ধরণে পানিতে পাট পচান হয়েছে।

আঁশের উজ্জল্যঃ এর পরিমাপ করা হয় আঁশ কতটা আলো প্রতিফলন করতে পারে।

আঁশের দৈর্ঘ্যঃ আঁশের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে কতটা কাটিং বাদ দেওয়া যেতে পারে তার উপর। সাধারনতঃ পা শ্রেণীর আঁশ ৩ থেকে ১০ ফিট বা তারও বেশী লম্বা হতে পারে। অভ্যন্তরীণ বাজারে আঁশকে প্রথমে দুই শ্রেণী বিভক্ত করা হয় (ক) কাঁচা শ্রেণি বিন্যাস এবং (খ) পাকা শ্রেণির বিন্যাস।

ক) আঁশের কাঁচা শ্রেণির বিন্যাসঃ যে সমস্ত আঁশ থেকে কাটিং বা নীচের শক্ত ছাল যুক্ত অংশ কেটে বাদ দেয়া য়নি সেই আঁশ গুলোই কাঁচা শ্রেণীতে পড়ে। এ শ্রেণী বিন্যাস শুধু অভ্যন্তরীণ বাজারেই প্রচলিত। এ বিন্যাস দ্ধতিতে সমস্ত তোষা এবং দেশী পাট আঁশকে আবার ৫টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যেমন টপ, মিডল, বি-টম, সি-বটম এবং ক্রস-বটম।

নিম্নে বিভিন্ন শ্রেণীর তোষা এবং দেশী পাটের শ্রেণীগত গুণাগুণ সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হলো-

দেশী পাটঃ

- **দেশী টপঃ** আঁশ খুব শক্ত ও লম্বা। সাদা অথবা মাখন-সাদা রং এর আঁশ এবং উজ্জল্যও প্রচুর। সম্পূর্ণ রূপে দোষমুক্ত এবং ওজন অনুপাতে কাটিং এর পরিমান ২০% এর বেশী নয়। কাটিং বাদ দেওয়ার পর এ সমস্ত আঁশকে পাকা শ্রেণী বিন্যাসে বাংলাদেশ দেশী 'স্পেশাল' রূপে নির্ধারিত হয়।
- **দেশী মিডলঃ** শক্ত এবং লম্বা আঁশ। সাদা থেকে হালকা লালচে রং এবং উজ্জল্যও প্রচুর। দোষমুক্ত এবং কাটিং এর পরিমান ওজন অনুপাতে ২০% এর বেশী নয়। কাটিং কেটে বাদ দিলে বাংলাদেশ দেশী 'এ' শ্রেণীর আঁশ রূপে চিহ্নিত হয়।
- **দেশী বি-বটমঃ** শক্ত ও লম্বা আঁশ। রূপসী ধুসর থেকে খড়ের মত এবং দুষণমুক্ত আঁশ। কাটিং এর পরিমাণ ২৫% এর বেশী নয়। পাকা শ্রেণী বিন্যাস এ সমস্ত আঁশ বাংলাদেশ দেশী 'বি' রূপে নির্ধারিত হয়।
- **দেশী ক্রস-বটমঃ** যে কোন রং এবং যে কোন শক্তির আঁশ। আঁশের মধ্যে কিছু শুকনা ছাল বা অন্য প্রকার ময়লা থাকতে পারে। কাটিং এর পরিমাণ ৪০% এর বেশী নয়। এ আঁশ পরবর্তী কালে পাকা শ্রেণীতে বাংলাদেশ দেশী 'ডি' রূপে চিহ্নিত হয়।

তোষা পাটঃ

- **তোষা টপঃ** আঁশ খুব শক্ত, লম্বা ও সোনালী বর্ণের হয়। খুব উজ্জল, পরিছন্ন এবং দোষমুক্ত আঁশ। কাটিং এর পরিমান ওজন অনুপাতে ১৫% এর বেশী নয়। এ সমস্ত আঁশ পরবর্তী কালে পাকা শ্রেণীতে বাংলাদেশ তোষা 'স্পেশাল' রূপে চিহ্নিত করা হয়।
- **তোষা মিডলঃ** শক্ত, লম্বা, উজ্জল রূপালী ধূসর থেকে সোনালী রং এর আঁশ। পরিছন্ন ও দোষমুক্ত। কাটিং এর পরিমান ১৫% এর বেশী নয়। এ আঁশ পাকা শ্রেণীতে বাংলাদেশ তোষা 'এ' রূপ নির্ধারিত হয়।
- **তোষা বটমঃ** শক্ত, লম্বা, উজ্জল রূপালী ধূসর থেকে লালচে রং এর আঁশ। দোষ মুক্ত এবং কাটিং এর পরিমান ২০% এর বেশী নয়। এ আঁশ পরবর্তী কালে বাংলাদেশ তোষা 'বি' রূপে পরিগনিত হয়।
- **তোষা সি-বটমঃ** যে কোন রং এর সাধারণ শক্তি সম্পন্ন আঁশ। দোষ মুক্ত ও পরিছন্ন। কাটিং এর পরিমান ২০% এর বেশী নয়। এ আঁশ পাকা শ্রেণীতে বাংলাদেশ তোষা 'সি' রূপে নির্ধারিত হয়।
- **তোষা-ক্রস বটমঃ** যে কোন রং এর এবং যে কোন শক্তি সম্পন্ন আঁশ। কিন্তু এতে শুকনা ছাল বা পাটখড়ি থাকতে পারে। কাটিং ২৫% এর বেশী নয়। এ আঁশ পরবর্তী কালে পাকা শ্রেণীতে বাংলাদেশ তোষা 'ডি' রূপে নির্ধারিত হয়।

(খ) আঁশের **পাকা শ্রেণী বিন্যাসঃ** অভ্যন্তরীন বাজার থেকে বিদেশে রপ্তানীর জন্য আঁশ চলে আসে বেলিং সেন্টারে এবং যেখানে রপ্তানীর পূর্বে আঁশের গোড়ার কাটিং বা শক্ত ছাল যুক্ত অংশ কেটে বাদ দেওয়া হয়ে থাকে। গোড়ার

শক্ত অংশ কেটে ফেলার পর আঁশকে পুনরায় পাকা ভাবে শ্রেণী বিন্যাস করে বিদেশে রপ্তানী করা হয়। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনষ্টিটিউট পাকা শ্রেণী বিন্যাস কালে দেশী এবং তোষা পাটকে নিম্নে লিখিত ৬টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে যা নিম্নরূপঃ

সারণী ৬: দেশী এবং তোষা পাট আঁশের পাকা শ্রেণীবিন্যাস

দেশী পাট	তোষা পাট
১। বাংলাদেশ দেশী 'স্পেশাল'	১। বাংলাদেশ তোষা 'স্পেশাল'
২। বাংলাদেশ দেশী 'এ'	২। বাংলাদেশ তোষা 'এ'
৩। বাংলাদেশ দেশী 'বি'	৩। বাংলাদেশ তোষা 'বি'
৪। বাংলাদেশ দেশী 'সি'	৪। বাংলাদেশ তোষা 'সি'
৫। বাংলাদেশ দেশী 'ডি'	৫। বাংলাদেশ তোষা 'ডি'
৬। বাংলাদেশ দেশী 'ই'	৬। বাংলাদেশ তোষা 'ই'

পাট ভিত্তিক শস্য বিন্যাস

বর্তমানে বাংলাদেশ প্রায় ৬-৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে প্রায় ১২-১৪ লক্ষ টন বা ৮০-৯০ লক্ষ বেল পাট উৎপাদন হয়। পাটের আঁশ প্রাকৃতিক তন্তু এবং পরিবেশ বান্ধব। পাট চাষে জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশের শস্য ধারায় পাট ফসলকে অর্ন্তভূক্ত করা হলে একদিকে যেমন জমির উর্বরতা সংরক্ষিত হবে অন্যদিকে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে বাংলাদেশে এক ফসলী জমিকে দুই, দুই ফসলী জমিকে তিন এবং তদ্রুপ তিন ফসলী জমিকে চার ফসলী জমিতে উন্নীত করা সম্ভব হলে ফসলের উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পাবে। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ফসলের উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল নতুন জাত শস্য ধারায় সংযুক্ত করা প্রয়োজন। নিবিড় গবেষণার মাধ্যমে একই সাথে পাট, পাট বীজ ও পাট শাকের সাথে অন্যান্য ফসলের সমন্বয় সাধন করে বছরে পাট ভিত্তিক চার ফসলী এমনকি পাঁচ ফসলী শস্য ধারায় রূপান্তর করা সম্ভব। কৃষক সাধারণতঃ প্রচলিত জাত ও চাষাবাদ পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। গবেষণার মাধ্যমে দেখা গিয়েছে যে উন্নত জাত ও চাষাবাদ অনুসরণ করে লাভ অনেকগুণ বাড়ানো যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক পাট-ভিত্তিক যে সমস্ত শস্য ধারা অনুসরণ করে তা নিম্নরূপঃ

ক) দুই ফসলী শস্য বিন্যাস

১। গম-পাট-পতিত	৮। আলু-পাট-পতিত	১৫। মাসকালাই-পাট-পতিত
২। পিয়াজ-পাট-পতিত	৯। রসুন-পাট-পতিত	১৬। কালোজিরা-পাট-পতিত
৩। মুসুর-পাট-পতিত	১০। সবজি-পাট-পতিত	১৭। চিনা-পাট-পতিত
৪। ভুট্টা-পাট-পতিত	১১। মরিচ-পাট-পতিত	১৮। মুগ-পাট-পতিত
৫। মটর-পাট-পতিত	১২। ধনিয়া-পাট-পতিত	১৯। সয়াবিন-পাট-পতিত
৬। সরিষা-পাট-পতিত	১৩। তামাক-পাট-পতিত	২০। সূর্যমুখী-পাট-পতিত
৭। বোরো-পাট-পতিত	১৪। মিস্টি আলু-পাট-পতিত	২১। পতিত-পাট-রোপা আমন

খ) তিন ফসলী শস্য বিন্যাস

১। গম-পাট-রোপা আমন	১২। মরিচ-পাট-রোপা আমন	২৩। সবজি-বোরো-পাট
২। পিয়াজ-পাট-রোপা আমন	১৩। ধনিয়া-পাট-রোপা আমন	২৪। মিস্টি আলু-পাট-রোপা আমন
৩। মুসুর-পাট-রোপা আমন	১৪। গম-পাট-মাসকালাই	২৫। আলু-বোরো-পাট
৪। সরিষা-পাট-রোপা আমন	১৫। মরিচ-বোরো-পাট	২৬। ছোলা-পাট-রোপা আমন
৫। আলু-পাট-রোপা আমন	১৬। সরিষা-বোরো-পাট	২৭। তিল-পাট-রোপা আমন
৬। ভুট্টা-পাট-রোপা আমন	১৭। সরিষা-পাট- সবজি	২৮। সরিষা-ভুট্টা-পাট
৭। সয়াবিন-পাট-রোপা আমন	১৮। মাসকালাই-পাট-রোপা আমন	২৯। মুগ-পাট-রোপা আমন
৮। তামাক-পাট-রোপা আমন	১৯। বাদাম-পাট-রোপা আমন	৩০। রসুন-পাট-রোপা আমন
৯। আদা-পাট-রোপা আমন	২০। সবজি-পাট-সবজি	৩১। মটর-পাট-রোপা আমন
১০। সবজি-রোপা আমন	২১। গম-পাট-সবজি	
১১। বোরো-পাট-রোপা আমন	২২। কালোজিরা-পাট-রোপা আমন	

গ) চার ফসলী শস্য বিন্যাস

১। সরিষা-বোরো-পাট-রোপা আমন	৬। আলু+লালশাক+মিষ্টি কুমড়া-পাট-মুলা
২। আলু-বোরো-পাট-রোপা আমন	৭। গম+মুসুর-পাট-মুগকালাই
৩। সবজি-পিয়াজ-পাট-রোপা আমন	৮। মুসুর+সরিষা-পাট-মুগকালাই
৪। ছোলা-মুগ-পাট-রোপা আমন	৯। মরিচ+টমেটো+ধনিয়া-পাট-রোপা আমন
৫। আলু+ডাঁটা-পাট-রোপন আমন	১০। আলু-পাট শাক-পাট-রোপা আমন

আগাম তোষা পাটের জাত ফসল বিন্যাসে অন্তর্ভুক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

ত্রিফসল বিন্যাসের ক্ষেত্রে রোপা আমন ও রবি ফসল বপনের সময়ের উপর আগাম তোষা জাত (বিজেআরআই তোষা পাট-৮, ৪ এবং ও-৯৮৯৭) এর বপন সময়ের বেশ শিথিলতা অনুসরণ করা যায়। নাবী তোষা জাত (ও-৪) এর তুলনায় আগাম তোষা জাত, পাট ভিত্তিক ত্রিফসল বিন্যাসে সামগ্রিকভাবে বেশী লাভ দেয়।

বপন/রোপণ সময়ঃ	ফসল সংগ্রহঃ
পাটঃ শেষ মার্চ।	পাটঃ জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ।
রোপা আমনঃ জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ।	রোপা আমনঃ ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ
গমঃ ডিসেম্বর ১ম সপ্তাহ।	রবি ফসলঃ মার্চ মাসের শেষ নাগাদ।

আগাম দেশী পাটের জাত ফসল বিন্যাসে অন্তর্ভুক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

ত্রিফসল উৎপাদন ধারার ক্ষেত্রে রোপা আমন ও গম বপন সময়ের উপর সম্প্রতি উদ্ভাবিত দেশী পাট জাতসমূহ বিজেআরআই দেশী পাট-৫ (বিজেসি-৭৩৭০) এবং বিজেআরআই দেশী পাট-৬ (বিজেসি-৮৩) এর বপন কালে বেশ শিথিলতা লক্ষ্য করা যায়। পাট ভিত্তিক ত্রিফসল উৎপাদন ধারায় বিজেসি-৭৩৭০ অন্যান্য দেশী পাট অপেক্ষা অধিক আর্থিক সুবিধা দেয়।

বপন/রোপণ সময়ঃ	ফসল সংগ্রহঃ
পাটঃ মধ্য মার্চ।	পাটঃ জুলাই মাসের ৩য় সপ্তাহ।
রোপা আমনঃ জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ।	রোপা আমনঃ ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ।
গমঃ ডিসেম্বর ১ম সপ্তাহ।	রবি ফসলঃ মার্চ মাসের শেষ নাগাদ।

লাভ ক্ষতির বিবরণ এবং প্রত্যাশিত ফলাফলঃ এই ফসল বিন্যাস পাট চাষীদেরকে অধিক হারে অর্থনৈতিক লাভবান করে। অধিকতর উৎপাদন ক্ষমতা তথা অর্থনৈতিক আয় অর্জিত হয়।

তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্যঃ পাট-রোপা আমন-গম ফসল বিন্যাসে দেশী পাটের জাত ব্যবহার করে কৃষক পর্যায়ে আঁশ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দেশী পাটের এলাকা বৃদ্ধি পাচ্ছে।